স্মৃতির পাতা থেকে

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

স্মৃতির পাতা থেকে

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

www.pathagar.com

স্মৃতির পাতা থেকে

– মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

প্রকাশক ঃ আবুতাহের মুহাম্মদ মা'ছুম
চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৫ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০১৭

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

মুদ্রণে ঃ আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

Smritir Pata Thake, By Maulana Motiur Rahman Nizami.Published by : Abu Taher Mohammad Ma'sum, Chairman, Publication Department, Bangladesh Jamaate Islami, 505 Baro Moghbazar, Dhaka-1217.

Fixed Price : Taka 50.00 (Fifty) only.

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

'স্মৃতির পাতা থেকে' লেখাটিতে রয়েছে ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্ব যিনি কিছু দিন আগে অগনন ভক্তদের কাঁদিয়ে চলে গেছেন মহান আল্লাহ তা'য়ালার সন্নিধানে, যার জন্য কোটি হৃদয়ে রক্তক্ষরণ আজো থামেনি, সেই নন্দিত ব্যক্তি শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর কিশোর বয়সের কচি মনের অনুভূতি। এছাড়াও লেখাটিতে মাওলানা মওদূদীর (রহ) সাথে মাওলানা নিজামীর (রহ) প্রথম সাক্ষাত, তৎপরবর্তী প্রতিক্রিয়া এবং মাওলানা মওদূদী (রহ) রচিত ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নে কি করে তাঁর ভিতরে ইসলামী আন্দোলনের ভীত রচিত হয়েছিল তা বিধৃত হয়েছে। দুনিয়ার শত প্রলোভন যে বয়সে একজন কিশোরকে আল্লাহর পথে চলতে বাধাগ্রস্থ করে, যে বয়সে একজন টগ্‌বগে যুবক সত্যের দিশা পেতে নানা মত-পথ দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে জাহিলিয়াতের অতল তলে হারিয়ে যায়। ঠিক সে বয়সে কি করে তিনি সঠিক পথের দিশা পেলেন তার কিছু বর্ণনাও এসেছে তাঁর এই লেখায়। আশা করি বিদগ্ধ পাঠক বইটি পাঠ করে অনেক উপকৃত হবেন।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
স্মৃতির পাতা থেকে	০৫
মায়ের কোলের একটি স্মৃতি	০৮
উড়োজাহাজ পড়ার স্মৃতি	০৯
একটি কোরবানীর ঈদের স্মৃতি	১২
স্কুল জীবনের সূচনা	১৪
মাদরাসায় পড়ার সিদ্ধান্ত	১৭
আরও কিছু স্মৃতি	৪৯

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

স্মৃতির পাতা থেকে

পাবনা জেলার সাঁথিয়া থানার যে নিভৃত পল্লীতে আমার জন্ম– সেই গ্রামটির নাম মনমথপুর। সাঁথিয়া থানা থেকে ঠিক দুই মাইল উত্তরে অবস্থিত এই গ্রামের পূর্ব ও দক্ষিণ দিক দিয়ে আঁকা-বাঁকা ইছামতি নদীটি বয়ে গেছে। এই নদীর একেবারে পূর্ব প্রান্তে যমুনা নদী আর পশ্চিম দিগন্তে পদ্মা। বাংলাদেশের ৩টি নদীর দুটির সাথে ছোট্ট এই নদীটির সংযোগ এক সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জেলা হিসাবে পাবনা জেলার এটা একটা বড় বৈশিষ্ট্য বলা যায়। এ জেলার পশ্চিম-দক্ষিণ দিক দিয়ে বয়ে গেছে দেশের প্রধান নদী পদ্মা বা গঙ্গা। আর পূর্ব দিক দিয়ে (উত্তর-দক্ষিণে) বয়ে গেছে যমুনা। ইছামতি নদীটি মনে হয় এই দুটি বৃহৎ নদীর সংযোগ খাল হিসাবেই সৃষ্টি হয়েছিল।

আমার জন্মস্থান যে গ্রামটি তা কিন্তু একেবারে নদীর ধারে অবস্থিত নয়। গ্রামের দক্ষিণ পাড়া প্রধানত হিন্দু পাড়া (সাহা পাড়া) অপেক্ষাকৃত নদীর কাছে কিন্তু একেবারে ধারে নয়। পূর্ব দিকে কিছু দূর মাঠ পেরিয়ে পুটি পাড়া গ্রাম ঘেঁষে উত্তর থেকে দক্ষিণে গিয়ে আবার পূর্ব ও দক্ষিণ দুই দিকেই নদীর দূরত্ব প্রায় সমান। কার্তিক মাস থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত আমরা একই নদীতে গোসল করতাম, আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে গিয়ে। আবার ফাল্গুন-চৈত্র ও বৈশাখ মাসে গোসল করতে যেতাম

www.pathagar.com

আমাদের বাড়ি থেকে পূর্ব দিকে একই নদীর পাড়ে। কারণ পূর্ব দিকের অংশে তখনও পানি মোটামুটি বেশি থাকত। আর দক্ষিণ দিকের পানি বেশ কমে যেত। কবি বলেছেন-

"আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে-বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।"

কবিতাটির বর্ণনা আমাদের এই প্রিয় নদীটির জন্যে অনেকাংশেই সত্য ও সঠিক বলা যায়।

আমাদের এই গ্রামের চার দিক দিয়েই ঘিরে আছে সবুজ শ্যামলীমায় ভরা ফসলের মাঠ। গ্রামের মাঝ দিয়ে নিচু রাস্তার দুই ধারে সারিসারি বাড়ি। কারো খরের ঘর কারো টিনের ঘর। আমাদের বাড়ির পূর্ব দিকে এই রাস্তাটা ছিল বেশ প্রশস্ত। আমরা ঐ রাস্তাতেই ফুটবল খেলেছি। খেলার ফাঁকে বল ফসলের মাঠে ঢুকলে মুরুব্বীদের বকুনিও খেতে হয়েছে। অগ্রহায়ণ মাসে ঐ প্রশস্ত রাস্তায় ধানক্ষেত থেকে ধান এনে জমা করা ও মারাই করার কাজও অনেককে করতে দেখেছি। আবার আখ মারাই ও গুড় জ্বালানোর জন্যেও ঐ রাস্তাটাই ব্যবহার করা হতো।

আমাদের গ্রামের উত্তরের কিছু অংশ ছিল বনাঞ্চল। পরিকল্পিত না হলেও প্রাকৃতিক ভারসাম্যের জন্যে এটা ছিল চমৎকার। ঐ বনাঞ্চলের এক পাশে কবরস্থান। এখন আর বন নেই, পুরোটাই পরিণত হয়েছে কবরস্থানে। ঐ বনাঞ্চল ও কবরস্থানের পূর্ব দক্ষিণ কোণে ছিল একটা ছোট্ট পুকুর। পুকুর পাড়ে এক সারিতে পাঁচ ছয়টি বড় আমের গাছ ছিল। গ্রীষ্মকালে দুপুরের তীব্র গরমের সময় আমরা ঐ আমগাছের ছায়ায় পাটি বিছিয়ে বিশ্রামও নিতাম। আবার পড়াশোনাও করতাম। আমাদের নিজ বাড়ীতে মসজিদ। যে ঘরে আমার জন্ম ঐ ঘরটি একেবারেই মসজিদ সংলগ্ন। গ্রামের খুব কম মসজিদেই আযান ইকামতের সাথে পাঁচওয়াক্ত জামায়াতের সাথে নামাজ হবার নজির সেই সময়ে খুব কমই ছিল। আমাদের বাড়ির মসজিদটি এ দিক দিয়ে ছিল ব্যতিক্রম। আযান-ইকামতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজই এখানে অনুষ্ঠিত হত। সেই সাথে রাতে গ্রামের অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত যুবকদের কোরআন শিক্ষা দেবারও ব্যবস্থা ছিল এখানে। আমাদের পার্শ্ববর্তী আর একটি গ্রাম সলংগী নামে পরিচিত। আমাদের গ্রামের সাথে এই গ্রামটি

www.pathagar.com

এতোটা সম্পৃক্ত যে এ দুটো গ্রামকে একই গ্রামের দুইটি পাড়া বিবেচনা করা যেতে পারে। গ্রামের স্কুলটি তাই স্থাপন করা হয় দুই গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে; স্কুলের জমি আমাদের পূর্ব পুরুষদের দেয়া। স্কুল প্রাঙ্গণে ছিল একটি ইদারা। যা থেকে গ্রীষ্মকালে দুই গ্রামের মানুষই পানি নিতো। পাশে ছিল বিরাট আকারের একটি তেঁতুল গাছ। যে গাছের তেঁতুল দুই গ্রামের মানুষই খেত। এছাড়া স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা খেয়ে বাড়ীর জন্যেও নিয়ে যেতো।

মাটি ও মানুষের মায়া মমতায় ভরা ছায়া ঘেরা এই পল্লী গ্রামটি আমার প্রিয় জন্মভূমি। আমার জন্মস্থান মনমথপুর গ্রামের সবচেয়ে বড় পরিবারটি হল খান পরিবার। গ্রামের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক বা তার চেয়েও বেশি লোকসংখ্যা এই খান পরিবারের। আমার জন্ম এই পরিবারেরই এক গরিব কৃষকের ঘরে। আমাদের পরিবার যে গোষ্ঠীর তাদের অনেকেরই জন্মের সন তারিখ লেখা থাকত। কিন্তু ঘটনাক্রমে আমার জন্মের সন তারিখ আব্বা-আম্মা সংরক্ষণ করেননি। যে জন্ম তারিখ ও সন আমার সার্টিফিকেট বা পাসপোর্টে লেখা আছে এটা আমার শিক্ষকদের অনুমাননির্ভর হিসাবের ফল। আমার আব্বা-আম্মার কাছ থেকে যতটা জেনেছি তাহল আমার জন্মের বছরটি ছিল আকাল বা দুর্ভিক্ষের। মাসটি ছিল চৈত্রের শেষ দিক। দিনটি ছিল শনিবার, আর জন্মের মুহূর্তটিতে মুশলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। আকালের বছরটি বাংলা ১৩৪৯ আর ইংরেজী ১৯৪৩ই হবার কথা।

আমাদের পরিবারের আমার দেখা মতে দুজন বুজর্গ ব্যক্তি ছিলেন। একজন সেই সময়ের এলাকার একজন বড় আলেম এবং যথেষ্ট সম্মানী ব্যক্তি আমার বড় চাচা মাওলানা ফয়জুল হক খান। অপরজন ছিলেন ডাঃ বরকাতুল্লাহ খান। তিনি কোলকাতা থেকে এলএমএফ পাস করে কিছু দিন সরকারি ডাক্তার হিসেবে চাকরির পর, নিজের বাড়ীতে বসে চিকিৎসা করতেন আর আল্লাহ-বিল্লাহ করে দিন কাটাতেন। কোলকাতায় পড়াশোনাকালেই তিনি পশ্চিম বঙ্গের ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মৌলানা আবু বকর সিদ্দিকীর (রহঃ) মুরীদ হন এবং কোলকাতা থেকে ফুরফুরা যাওয়া আসা করতে করতে ডাক্তারী পেশার চেয়ে ইবাদত বন্দেগীর দিকেই বেশি ঝুঁকে পড়েন।

www.pathagar.com

আমার আব্বা ও চাচারা ছিলেন তিন ভাই। আব্বা তাদের মধ্যে সবার ছোট। দাদার মৃত্যুর সময় আব্বার বয়স ছিল খুবই কম। তিনি লেখাপড়ার সুযোগ পাননি। তবে পারিবারিক ঐতিহ্যের সুবাদে প্রাথমিক দ্বীনি শিক্ষা মোটামুটি ভালভাবেই আয়ত্ত করেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীর প্রতি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান।

মায়ের কোলের একটি স্মৃতি

মনমথপুর গ্রামের খান পরিবারের যে বাড়ীতে আমার জন্ম এই বাড়ীতে তখন ছিল আটটি পরিবারের বাস। পাশেই উত্তর-পূর্ব দিকে ছিল খান পরিবারের আরো পাঁচটি পরিবারের বাস। আমাদের বাড়ীটি ছিল পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা। উভয় বাড়ীর একটা অভিন্ন বৈশিষ্ট্য ছিল। আমাদের বাড়িটার উত্তর দিয়ে যেহেতু রাস্তা ছিল তাই বৈঠক খানাগুলো ছিল রাস্তা ঘেঁষে বাড়ীর উত্তর প্রান্তে। বসতী ঘরগুলো মাঝখানে আর রান্না ঘর বা অন্দর মহল ছিল একই সারিতে দক্ষিণ দিকে। মেয়েরা একবাড়ি থেকে অন্যবাড়িতে যেতে পুরুষের মুখোমুখি হবার কোন আশংকা ছিল না। আবার উত্তর পাশে বৈঠক খানা থাকার কারণে বাইরের লোকজন বাড়ির পূর্বপ্রান্তে থেকে পশ্চিম প্রান্ত যেতে কোন অসুবিধা হত না।

পাঁচ শরিকের অপর বাড়িটিও ছিল অনুরূপ। সেখানে পূর্বদিকে বৈঠক খানা, পশ্চিম দিক দিয়ে অন্দর মহল বা রান্নাঘর এর মাঝখান দিয়ে ছিল থাকার বা বাস করার ঘরসমূহ।

আমাদের এলাকায় বর্ষাকালে আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই চার মাস নৌকা ছাড়া যাতায়াতের কোন বিকল্প ছিল না। এই চার মাস আমাদের সকলেরই নৌকা থাকত ঘাটে। আমাদের বাড়ির উত্তর দিকের রাস্তা দিয়ে বর্ষায় নৌকা যাতায়াত করত। আমাদের বাড়ির পূর্ব দক্ষিণেও নৌকা থাকত। আবার পূর্ব উত্তর কোণেও নৌকা ভিড়ানো থাকত। আষাঢ় মাসে বর্ষার সূচনায় আমাদের গ্রামে পানি ঢুকতো সাধারণত দুই দিক দিয়ে। বড়াল নদী উপচে পানি আসতো আমাদের গ্রামের উত্তর দিক থেকে। আমাদের গ্রামের মানুষের প্রধান আমন ফসলের মাঠটি গ্রামের উত্তরেই

www.pathagar.com

অবস্থিত। আবার যমুনা নদী হয়ে ইছামতি দিয়ে গ্রামের পূর্ব দিকে পুটিপাড়া গ্রামের মধ্য দিয়ে আসা একটি ক্যানেল দিয়ে গ্রামের পূর্ব প্রান্তের মাঠ হয়ে পানি আসত আমাদের বাড়ি সংলগ্ন ডোবায়।

নতুন পানির মাসে নতুন পানির সমারোহ। ঘাটে নৌকার অবস্থান প্রতিবছর আষাঢ় মাস হলেই বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেতো। আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের আলোকে মহিলাদের এ দৃশ্য দেখার জন্যে বাইরে যেতে হত না। বাড়ীর পূর্ব দক্ষিণ কোণের ঘাটটি ছিল তাদের জন্যে সংরক্ষিত, নৌকায় উঠতে হলেও তারা এখান থেকেই উঠতেন। নতুন বর্ষার এই স্মৃতি কোন এক বছরে মায়ের কোলে থেকে উপভোগ করার স্মৃতি আমার চোখে কেন যেন মাঝে-মাঝেই ভেসে উঠে। মায়ের কথা মনে হলেই পয়লা যে স্মৃতিটি বা ছবিটি ভেসে উঠে তা হল মা আমাকে কোলে নিয়ে বর্ষার আগমনী দৃশ্য দেখে ছিলেন। আমাকেও দেখাচ্ছিলেন। আমি তখন কত বয়সের শিশু তা মনে নেই। সন তারিখ তো মনে থাকার প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু ছবির মতই সেই দৃশ্যটা আমি যেন এখনও দেখছি একেবারেই চোখের সামনে। আর আধো আধো ভাষায় পানির দিকে হাত উঁচিয়ে মাকে বলছি, মা কতো পানি।

উড়োজাহাজ পড়ার স্মৃতি

আমার আম্মার আমি ছিলাম একমাত্র পুত্র সন্তান। আমার আগে আমার দু'বোন জন্মগ্রহণ করেন। আব্বা-আম্মার কামনা ছিল একটি পুত্র সন্তানের। তাদের ঐকান্তিক বাসনা আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ায় আমার প্রতি আব্বা-আম্মার আদর যত্নের কোন কমতি ছিল না। গরিব ঘরে জন্মেও আমি যে আদর সোহাগ ও যত্ন পেয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমার আব্বা-আম্মার আদরের পাশাপাশি আমার নানা এবং বড় চাচার আদর স্নেহও ছিল সীমাহীন। নানার তিন মেয়ের মধ্যে ২ জনই মারা যায়। আমার মা, নানার সন্তানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আদর পেয়েছেন। মেয়ের ঘরের একমাত্র নাতি হিসাবে আমার কদর ছিল নানা বাড়িতে সবচেয়ে বেশি। একটু একটু হাঁটতে শিখেছি এই সময়ই ছিল মুরুব্বীদের মনোযোগের প্রকৃত সময়। এই সময়ে আব্বা-আম্মার পাশাপাশি নানা এবং বড় চাচার মনোযোগটা আমার প্রতি যে একটু বেশি তা বুঝতে পারি।

www.pathagar.com

আব্বা ও চাচাদের পৃথক পৃথক সংসার হলেও আমাদের আবাসন পদ্ধতির কারণে অনেকটা একান্নভুক্ত পরিবারের মতই মনে হতো। কেবল হাঁটা শিখার সময়টা তো দিকবিদিক দৌঁড়ে বেড়ানোর সময়। আমাদের ভেতরের বাড়িতে বা বাইরের বৈঠক খানার সামনে দৌঁড়ে বেড়ানোর প্রচুর জায়গা ছিল। মসজিদের সামনে বাইরে এতটা খোলা জায়গা ছিল যে সেখানে মোটামুটি ছোটখাট একটা মজলিসও হত। বাড়ির ভেতর থেকে বাইরে একটু ছোটাছুটি করতেই দেখলাম একটা উড়োজাহাজ আমাদের গ্রামের উপর দিয়ে চক্কর দিচ্ছে। গ্রামের উপর মানে বাড়ির উপর দিয়ে চক্কর দিচ্ছে। হঠাৎ আমাদের গ্রামের উত্তর দিকে এগিয়ে যাবার পর আর উড়োজাহাজটি দেখতে পেলাম না। গ্রামের লোকজনের শোরগোল শুনলাম জাহাজটি নাকি দীঘা বিলে পড়ে গেছে।

সময়টা ছিল বর্ষার সূচনাকাল। মাসটা সম্ভবত আষাঢ় মাসের শেষের দিকটাই হবে। তখনও বর্ষা পুরোদমে না হলেও আমাদের বাড়ির ঘাটে পানি এসে গেছে। আমাদের গ্রাম থেকে এমনকি বাড়ি থেকে ঐপারে যাওয়া উড়োজাহাজটি দেখার জন্যে নৌকাযোগেই লোকেরা যেতে থাকে। আশপাশের সব গ্রাম থেকেই এভাবে লোকেরা যেতে থাকে। বর্ষাকাল না হলে পায়ে হেঁটে যাওয়ার সুযোগ থাকলে বোধহয় আরো ব্যাপকভাবে লোকেরা ভিড় জমাতো।

আমার মত ছোট বয়সের শিশুদের যাওয়ার সুযোগ হয়নি। অভিভাবকগণ শিশুদেরকে নেয়া নিরাপদ মনে করেননি। আমাদের বাড়ি থেকে চাচাতো ভাইরা এবং বাড়ির চাকর বাকরদের অনেকেই গিয়েছিল ঐ জাহাজটি দেখতে। আমি তখন কত বছরের ছিলাম মনে নেই। তবে কেবল হাঁটতে শিখেছি এটাই মনে আছে। পড়ে যাওয়া জাহাজটির ঘুর-পাক খাওয়ার দৃশ্যটি এখনও মাঝে মাঝে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে। উড়োজাহাজটি দীঘাবিলের ভরা পানিতে পড়ার কারণে অন্যকোন অঘটন ঘটেনি। যারা দেখতে গিয়েছিল তাদের কাছে শুনেছি উড়োজাহাজের যে ক'জন লোক ছিল সবাই ইংরেজ। তারা বোটযোগে ডাঙ্গায় চলে আসে এবং স্থানীয় কতিপয় শিক্ষিত লোকের সহযোগিতায় তারা নিরাপদে তাদের নিজস্ব স্থানে চলে যেতে সক্ষম হয়।

www.pathagar.com

দুর্ঘটনা কবলিত জাহাজটি অনেক দিন ঐ বিলে থেকে যায় পরিত্যক্ত অবস্থায়। লোকজন দেখতে গিয়ে যার-যার সুবিধামত উড়োজাহাজের অনেক সরঞ্জাম নিয়ে যায় বাড়িতে। কেউ ওগুলো সংরক্ষণ করে দেখার বস্তু হিসেবে। কেউ আবার ওগুলোকে নিজেদের মত করে কাজেও লাগায়। অবশ্য আমাদের ঘরে ঐ জাহাজের সামান্যতম কোন জিনিসও আনা হয়নি। আব্বা নিজে ওসব ঝামেলায় জড়ানো আদৌ পছন্দ করতেন না।

ঐ বছরের গোটা বর্ষাকালটাই এলাকার জন্যে এটা ছিল সবচেয়ে বেশি আলোচনার বিষয়। দূর-দূরান্ত থেকে নৌকাযোগে মানুষ আসতে থাকে পরিত্যক্ত জাহাজটি দেখার জন্যে।

এখানে উল্লেখ করা যায় আমাদের গ্রামের মাঠ শেষেই শুরু হয় সোনাতলা গ্রামের মাঠ। সোনাতলা গ্রামের মাঠের সাথে মিশে আছে আরো বেশ কয়েক গ্রামের মাঠ। সোনাতলার মৌজার মাঠের মধ্যে ছিল ছোট বড় তিনটি বিল। মাঝারি বিলটির নাম ছিল ভোমড়া বিল। আর সবচেয়ে বড় এবং দীর্ঘ বিল যার নাম ছিল দীঘা বিল। এই বড় বিলটাতেই পড়েছিল বা যান্ত্রিক বৈকল্যের কারণে জরুরিভাবে অবতরণ করেছিল ঐ উড়োজাহাজটি। পরবর্তী পর্যায়ে এই ঘটনা দুর্ঘটনার কোন কারণ জানা সম্ভব হয়নি। স্মরণযোগ্য ঐ বছরই বর্ষা চলে যাওয়ার পর উড়োজাহাজটি ডিনামাইট দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হয়। আমাদের বাড়িতে আমার বড় চাচার বড় ছেলের ঘরে তখন আমাদের পরিবারের তৃতীয় প্রজন্ম অর্থাৎ বড় চাচার এক নাতি ছেলের জন্ম হয়। নাম তার হামিল হক (সন্টু)। আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে বড় চাচা তার কানে তুলা দিয়ে রাখতে বলেছিলেন বেশ জোর তাগিদ দিয়ে যাতে ডিনামাইটের আওয়াজে তার কানের কোন ক্ষতি না হয়।

উড়োজাহাজটি কেন এভাবে ডিনামাইট দিয়ে ধ্বংস করতে হল সে ব্যাখ্যা তালাশ করার মত কেউ আমাদের এলাকায় তখন ছিল কিনা আমার জানা নেই। যারা ওটা ধ্বংস এসেছিল তারাও ছোট পেন্টন নিয়ে আসছিল। সেটা হয়তবা সি পেন্টাইন জাতির কিছু একটা হবে। ডিনামাইট ফাটিয়ে পেন্টাইনটির ধ্বংস হতে দেবার জন্যে কাছে লোকজন যেতে পেরেছিল কিনা জানি না তবে আমাদের গ্রামের উত্তর পাশে দাঁড়িয়ে লোকেরা উড়োজাহাজ ধ্বংসের ধোঁয়া দেখার চেষ্টা করেছে আমি নিজেও গ্রামের

www.pathagar.com

উত্তরে মানুষের ভিড়ের মধ্যে থেকে দীঘা বিলের দিকে কালো ধোঁয়া উড়ার দৃশ্যটি দেখছি বলে এখনও বেশ মনে পড়ে। পরবর্তী সময়ে মুরুব্বীদের নিকট থেকে শুনেছি উড়োজাহাজটি পড়েছিল ১৯৪৫ সনে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে।

একটি কোরবানীর ঈদের স্মৃতি

আমাদের গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে ইছামতি নদীর পাড়ে ছিল ঈদের মাঠ। দুই গ্রামের মানুষ মিলে এখানে বছরে দুই ঈদের নামাজ আদায় করত। এই মাঠে আমার দাদা মরহুম গাওহারুদ্দীন তখন ইমামতি করতেন। দাদার ইন্তিকালের পর সামাজিকভাবে চলে আসা রেওয়াজ অনুযায়ী বড় চাচার উপর দায়িত্ব অর্পিত হয় ইমামতির। তিনি পূর্ববর্তী ইমামের বড় সন্তান হিসেবেই শুধু নয় তখনকার দিনে আশপাশ ১০/১৫ গ্রামের মধ্যে তিনিই ছিলেন এলাকার সবচেয়ে বড় আলেমেদ্বীন ও বুজুর্গ ব্যক্তি। অবশ্য পরবর্তী পর্যায়ে তিনি আমাদের গ্রাম থেকে ৬ মাইল দূরে হুইখালি, মানপুর, কল্যাণপুর ও সৈয়দপুরের কয়েক গ্রামের একটি বড় ঈদের জামায়াতের ইমামতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন সেখানকার লোকদের অনুরোধে। আর আমাদের দুই গ্রামের এই ঈদের জামায়াতের দায়িত্ব অর্পণ করেন তার অন্যতম চাচাতো ভাই আমাদের খান পরিবারের অন্যতম বুজুর্গ ব্যক্তি ডাঃ রাকাতুল্লাহ খানের উপর। তিনি প্রচলিত অর্থে মাদরাসায় শিক্ষিত আলেম ছিলেন না বটে তবে নিজস্ব চেষ্টায় ইসলামী জ্ঞান গবেষণায় বেশ অগ্রসর ছিলেন। তিনি ফুরফুরা সিলসিলার ব্যক্তি হিসেবে বেশ সম্মানী ব্যক্তি ছিলেন।

ঈদের নামাজ শেষে গ্রামের লোকেরা নিজ নিজ সমাজের ভিত্তিতে একত্রে বসে শিন্নী বণ্টন করত। যার মধ্যে খিচুরী, পায়েস ও মুড়ি.... থাকত। ঈদুল ফিতরে শুধু এভাবে শিন্নী বণ্টনই ছিল একমাত্র কর্মসূচি। কিন্তু ঈদুল আজহার প্রথমে ঐ একইভাবে শিন্নী ভাগ বণ্টনের পর কোরবানি দিতে দিতে বেশ বিকেল হয়ে যেত। গোশত বানিয়ে বিতরণ করতে করতে বেশ রাতই হয়ে যেত।

www.pathagar.com

আমাদের খান পরিবারের এবং সমাজের অন্য কোন পরিবারের কোরবানির পশু সব একত্র জমা করা হত। কোরবানি দাতার অংশ আলাদা করে দেবার পর সব গোশত একত্রিত করে ওজন করা হত এবং সমাজের পরিবারের সদস্যদের মোট সংখ্যাকে সামনে রেখে মাথা পিছু ভাগ করে পরিবারের মধ্যে সদস্য সংখ্যানুপাতে বণ্টন করা হত। এতে বণ্টনটা খুব সুন্দর এবং সুষ্ঠু ও সুক্ষ্ম হত। তবে সময় লাগত খুব বেশি। অনেক রাত হয়ে যেত নিজেদের কোরবানির অংশের গোশত আগে পাওয়া গেলে রাতে কোরবানির গোশত খাওয়া সম্ভব হত। এছাড়া ভাগের গোশত রান্নার পর শিশুদের জন্যে ঐ রাতেই কোরবানির গোশত খাওয়া সম্ভব হত না। অন্তত আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হত না। কারণ আমি সন্ধ্যা নেমে আসার সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়তাম; রাতের খাওয়া অনেক সময়েই আমার পক্ষে সম্ভব হত না। যাহোক আমি স্মরণ করছি পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি জন্ম নেয়ার এক বছর আগের একটি কোরবানির ঈদের কথা। আগের বর্ণনানুযায়ী ঈদের জামায়াত শেষ করে শিন্নী বিতরণ শেষে কোরবানির আয়োজন দেখে আমি আমার অভ্যাস অনুযায়ী ঘুমিয়ে পড়েছি। সকালে ঘুম থেকে উঠেই আম্মাকে ডাকছি কোরবানির গোশত খেতে দেয়ার জন্য। আম্মা কিছু বলার আগেই আমার বড় বোন বলে উঠল তুইতো সাত সকালে ঘুমিয়ে গেছিস রাতে কী হয়েছে, কিছু টের পাসনি। গোলমালের গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। কাটা-কাটি মারামারির খবর শুনে রাতে আর গোশত ভাগ বণ্টন হয়নি। লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাই কোন গোশত রান্না করা যায়নি। আম্মা গোশত দেবেন কোথা থেকে!

সম্ভবত এই ঘটনাটি ছিল ভারত বিভক্তির পূর্বে সংঘটিত ইতিহাসের জঘন্যতম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জের হিসেবে। কোলকাতা ও তার আশে পাশে এবং তার জের হিসেবে নোয়াখালীতে দাঙ্গা হয়েছিল বলে শুনেছি। আমাদের এলাকায় এর আভাস ইংগিত বা আলামত কিছুই ছিল না। কিন্তু শুধু গুজব আর আতংকের কারণেই কোরবানির ঈদের অনুষ্ঠানের একটি অংশ পণ্ড হয়ে যায় এ আমাদের গ্রামের মত অজপড়া গ্রামেও।

www.pathagar.com

স্কুল জীবনের সূচনা

এবার স্কুলে যাবার পালা। আমার বড় দুই বোনের সাথে গ্রামের স্কুলে যাওয়া শুরু হয় আমার একেবারেই অল্প বয়সে। বোনদের সাথে এমনি এমনি যাই। কোন নির্দিষ্ট ক্লাসে নয় যে কোন ক্লাসে গিয়ে বসি। দুই বোনের ক্লাসে পালাক্রমে বসি। বোনদের বান্ধবীরাও আদর করে তাদের কাছে বসায়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক আমার বড় চাচা। অতএব স্কুলে আমার প্রতি সকলেরই ছিল একটি স্নেহ-মমতার নজর। আমার স্কুল জীবনের প্রথম বছরের শুরুর দিকেই বড় বোনের বিয়ে হয়ে যায়। আমি এখন অনুমান করি সম্ভবত ঐ বিয়েটা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে মানে শীতকালে। আমরা এলাকার রেওয়াজ অনুযায়ী বর ও বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে আমি বাড়ি থেকে বেশ কিছু এগিয়ে গিয়েছি মিছিল সহকারে। মিছিলে মূল শ্লোগান ছিল নওশাহ মিয়া জিন্দাবাদ। সেই সাথে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবর ধ্বনির পাশে আমরা চাই পাকিস্তান এই শ্লোগানও ছিল। এই কারণেই আমার অনুমান আমার বড় বোনের বিয়ের বছরটি ১৯৪৭ সন। আমি তখন শিশু শ্রেণীর ছাত্র। তাছাড়া আমার যতদূর মনে পড়ে ঐ বছরই বর্ষাকালে কোন এক ভোরে আমাদের বাড়ীর মসজিদের পাশে ফজরের পরপরই পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করা হয় ছোটখাট একটা গ্রাম্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সেখানে পাকিস্তান জিন্দাবাদ স্লোগান এবং জাতীয় পতাকার কথা এবং দো'আ ও মিষ্টি বিতরণের কথাও মনে পড়ে।

সাধারণত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণী থেকে ১ম শ্রেণীতে যাওয়ার কথা। কিন্তু আমাকে এবং আমাদের পাশের আর একজন শিশু শ্রেণী থেকেই ২য় শ্রেণীতে ভর্তি করে নেয়া হল। মাস দুয়েক পরে অপরজনকে আবার ১ম শ্রেণীতে নামিয়ে দিলেও আমাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতেই রেখে দেয়া হল। এই বছরেই আমি ও আমাদের পরিবারের কয়েকজন চাচাতো ভাই (যাদের সবাই আমার চেয়ে বয়সে বড়) নামাজ শুরু করি। বাড়িতে আমরা মসজিদে আব্বা-চাচাদের সাথে জামায়াতে নামাজ শুরু করি। ফজরের জামায়াত ধরার জন্যে আমরা ক'জন মিলে মসজিদ সংলগ্ন কাচারি ঘরে ঘুমাই যাতে ফজরের জামায়াত ধরতে কোন অসুবিধা না হয়। জোহরের নামাজ আমরা স্কুলের পাশের বড় একটা

www.pathagar.com

কাচারি ঘরে আদায় করতাম। বাড়িতে মসজিদে ইমামতি করতেন সাধারণত বড় চাচা। তার অনুপস্থিতিতে অন্য কোন মুরুব্বী। স্কুলের সময়ের নামাজেও প্রধান শিক্ষক বড় চাচাই ইমামতি করতেন।

আমি যখন শিশু শ্রেণীর ছাত্র সে বছরই ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। পরের বছর আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। পাকিস্তান অর্জনের এক বছরের মাথায় অর্থাৎ ১৯৪৮ এর সেপ্টেম্বর মাসে কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ইন্তিকাল করেন। কায়েদে আজমের ইন্তিকালের খবর নিয়ে একটি ঘটনা ঘটে আমাদের বাড়িতে। আমাদের পাশের গ্রামে গোয়ালা দুধ নিত রোজ আমাদের বাড়ি থেকে। ঐদিন সকাল বেলা দুধ নিতে এসেই সে কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ইন্তিকালের খবরটা প্রচার করে। বাড়ির ভেতর থেকে বড় চাচা যখন শুনলেন যে গোয়ালা কায়দে আজম মারা গেছে বলে প্রচার করছে। সাথে সাথেই তিনি রাগতস্বরে হুকুম দেন যে, বেটাকে বাঁধ সে কেন গুজব ছড়াচ্ছে। চাচা ভেবেছিলেন এই ব্যাপারে হিন্দুরা কোন গুজব ছড়াতেই পারে। পরে অবশ্যই পরিস্কার হয়ে গেল, ওটা গুজব ছিল না। সত্যি সত্যি ঐদিনই কায়েদে আজম শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

এ খবর বড় চাচাকে খুবই মর্মাহত দেখতে পেলাম। সদ্য অর্জিত দেশের প্রতিষ্ঠার শুরুতে এভাবে চলে যাওয়ায় দেশের ভবিষৎ নিয়ে চিন্তা হওয়াটা তার মত ব্যক্তির জন্যে মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। আমাদের বাড়ির মসজিদ সংলগ্ন বৈঠক খানায় সামাজিক বিচার শালিসের সাথে সাথে দেশের রাজনীতি নিয়েও আলোচনা হত। আমাদের বাড়িতে তখনকার দিনের অর্ধ সাপ্তাহিক পাকিস্তান নামক পত্রিকাটা আসত। বড় চাচার নামেই আসত, যারা পড়তে চাইতো পড়ার সুযোগ ছিল। কায়েদে আজমের শূন্যস্থানকে পূরণ করতে পারে চাচা এগিয়ে ভাবতে থাকেন তার বিবেচনায় লিয়াকত আলী খান, খাজা নাজিমুদ্দিনই এ শূন্যস্থান পূরণ করতে পারে। আমরা খবরে দেখলাম খাজা নাজিমুদ্দিন গভর্নর জেনারেল হলেন, আর লিয়াকত আলী খান প্রধানমন্ত্রীই থাকবেন।

www.pathagar.com

ভাল কথা, ঐ গোয়ালাকে রাগের মাথায় বড় চাচা বেঁধে রাখার কথা বলেছিলেন, পরের দিন বড় চাচা তাকে নিজের আবেগের কথা বুঝিয়ে বলে সুন্দর ভাষায় মাফ চাইলেন। ঐ গোয়ালা বেচারা এতে খুবই অভিভূত হল। বড় চাচা এমনিতেই এলাকার সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। ঐ গোয়ালাও বড় চাচাকে পিতৃতুল্য ভক্তি করতো। তিনি রাগের মাথায় একটা কথা বলার পর তার জন্যে অনুতপ্ত হলেন, ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেন এটা সে ভাবতেও পারেনি।

আমাদের বাড়িতে খান ব্রাদার্স লাইব্রেরী নামে একটা পারিবারিক লাইব্রেরী ছিল। ডাক্তার চাচার কাচারি ঘরে দুটো আলমারীতে লাইব্রেরীর বইগুলো সংরক্ষিত থাকতো। যারা পড়াশোনা করতে ইচ্ছুক তারা ওখান থেকে বই নিয়ে পড়াশোনা করতো। ঐ লাইব্রেরীতে কোরআনের তাফসির, বাইবেল এবং হিন্দুদের মহাভারত পর্যন্ত ছিল। রবিন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি, সঞ্চিতাসহ প্রচুর বইপুস্তক ছিল। তার সাথে বেশকিছু ভাল ভাল মাসিক পত্রিকা সংকলন ছিল। আমার জন্যে খুবই আকর্ষণীয় ঐ সব পত্রিকায় আসা মূল্যবান গবেষণা ধর্মীয় লেখাপড়ার নেশায় আমাকে পেয়ে বসে ছোট বেলা থেকেই। বিশেষ করে আল ইসলাম ও মাসিক মুহাম্মদী পত্রিকার লেখাগুলো ছিল খুবই তথ্য সমৃদ্ধ।

পারিবারিক লাইব্রেরীর বই পুস্তক এবং পত্র-পত্রিকা ছাড়াও আমাদের বড় চাচা, মেঝ চাচা এবং ডাক্তার চাচার ব্যক্তিগত সংগৃহীত বই পুস্তকও ছিল অনেক। তিনজনেরই স্নেহের পাত্র হবার কারণে তাদের বইপুস্তক দেখার ও পড়া শোনার ব্যাপারে আমার ছিল অবাধ সুযোগ। বড় চাচার ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল আরবী ফারসী এবং উর্দু কিতাবই বেশি। ইমাম গাজ্জালী (রঃ) এর 'কিমিয়ায়ে সা'দাত' এর বঙ্গানুবাদ 'সৌভাগ্যের পরমশনি' বইটি আমি খুব ছোট্ট বয়সে পড়ার সুযোগ পাই, মেঝ চাচার সংগৃহীত পুস্তক ভান্ডার থেকে।

www.pathagar.com

মাদরাসায় পড়ার সিদ্ধান্ত

গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়া শেষে আমাকে মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার জন্যে আমার নানা সাহস করে নিয়ে গেলেন বোয়ালমারী মাদরাসায়। বড় চাচার একান্ত ইচ্ছা তার স্নেহধন্য ভাতিজা একজন আলেম হবে। আব্বা-আম্মারও ইচ্ছা তাই। আর বোয়ালমারী মাদরাসায় পড়তে হলে নানা বাড়িতে থেকেই পড়তে হবে। তাই নানাকেই এ ব্যাপারে বেশি আগ্রহী মনে হল আমার মাদরাসায় ভর্তির ব্যাপারে।

১৯৫১ সনের জানুয়ারীতে আমাকে বোয়ালমারী মাদরাসায় ভর্তি করে দেয়া হল। প্রাইমারী স্কুল থেকে চতুর্থ শ্রেণী পাস করে এসে আবারও ঐ চতুর্থ শ্রেণীতেই ভর্তি হতে হল। কারণ প্রাইমারী স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত আরবী বা দ্বীনিয়াত পড়ার ব্যবস্থা না থাকা। তবে পরের বছরই আমাকে পঞ্চম শ্রেণীর পরিবর্তে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সুযোগ দেয়া হয় ডবল প্রমোশন দিয়ে।

বোয়ালমারী মাদরাসায় ভর্তির অল্প কিছু দিন পরে সাঁথিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও বোয়ালমারী মাদরাসার ছাত্রদের সম্মিলিত একটি মিছিলে যোগদানের কথা আমার বেশ মনে পড়ে। বরযাত্রীদের স্বাগত জানানো ছাড়া বা গ্রামের ওয়াজ মাহফিলে কোন ওয়ায়েজ বা পীরকে স্বাগত জানানো ছাড়া রাজনৈতিক প্রকৃতির কোন মিছিলে আমার এটাই ছিল প্রথম যোগদান। সেই মিছিলের উদ্দেশ্য ছিল (যা পরে বুঝেছি) হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সংহতি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা। মিছিলের দুটি শ্লোগানের ভাষা থেকে এটা বুঝেছি। শ্লোগান দুটি ছিলঃ হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই, পাকিস্তান হিন্দুদেরও। উক্ত মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সাঁথিয়া হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র আমাদের আত্মীয় মাহতাব ভাই। এই বছরের কোন এক সময়ে রাওয়ালপিন্ডিতে আততায়ীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান। আমরা গ্রামের বাড়ি থেকে মাদরাসায় যাওয়ার পথে খবরটা শুনলাম। মাদরাসায় পৌঁছে জানলাম আজ আর ক্লাস হবে না। প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুর কারণে ছুটি। তাড়াতাড়িই বাড়ি ফিরে গেলাম। আমাদের বাড়িতে চাচাদের মধ্যে রাজনীতি নিয়ে দেশ নিয়ে বেশ আলোচনা হত। আত্মীয়-স্বজনরা এলেও মুরুব্বীদের সাথে দেশ নিয়ে আলোচনা করতে দেখেছি।

www.pathagar.com

লিয়াকত আলীকে হত্যার পর দেশের ভাগ্যে কী ঘটতে যাচ্ছে, হত্যাকাণ্ডের পেছনে কারা, এ নিয়ে নানামুখী আলোচনা হয় আমাদের মসজিদ সংলগ্ন কাচারি ঘরে। পরের দিন জানা গেল গোলাম মুহাম্মদকে গবর্নর জেনারেল করা হয়েছে আর খাজা নাজিমুদ্দিনকে গবর্নর জেনারেল পদ থেকে সরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদ নিতে হয়েছে। আমি ছোট বেলায় বেশ চঞ্চল ছিলাম, স্বভাবের দিক দিয়ে যদিও কথা খুব কম বলতাম। কিন্তু এই সংবাদটি শুনে কেন যেন তাৎক্ষণিকভাবে ঝটপট আমার মুখ থেকে একটি অবাঞ্ছিত কথা বেরিয়ে গেল "পাকিস্তান গোল্লায় যাবে"। এমন মন্তব্যের মূল কারণ ছিল আমাদের বাড়িতে নিয়মিত অর্ধসাপ্তাহিক পাকিস্তান পত্রিকাটি আমি পড়ার চেষ্টা করতাম। নানাবাড়িতে দৈনিক আজাদ পত্রিকাটাও দেখতাম। পত্রিকায় প্রকাশিত নেতৃবৃন্দের ছবি খুব মনোনিবেশ সহকারে দেখতাম। লিয়াকত আলী খানের ছবি দেখে তাকে যেমন স্মার্ট এবং চৌকস মনে হত, খাজা নাজিমুদ্দিনের চেহারা দেখে তেমনটি কেন যেন আমার মনে হত না। এমন নেতিবাচক মন্তব্যের মূল কারণ ছিল ছবি দেখে নাজিমুদ্দীন সাহেবের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমার নিজস্ব ধারণা। আমার মুখের এ মন্তব্য শুনেই মেঝ চাচা ধমক দিয়ে সতর্ক করলেন ছোট মুখে এমন কথা বাবা মানায় না। পুলিশ শুনলে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে। তখনকার দিনে এমন ধারণা গ্রামে গঞ্জের মানুষের জন্যে ছিল খুবই স্বাভাবিক। যাহোক আমার সেদিনের কচিমনের সেই আশংকা বাস্তবে কি হয়েছে ইতিহাস তার সাক্ষী।

১৯৫২ সালে আমি বোয়ালমারী মাদরাসায় ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়াশোনা করছি। এ বছরটি বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য বছর। স্বাধীনতার বীজ বপন হয় এই বছরেই। একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার হঠকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দেয়ার দাবিতে প্রচণ্ড এবং এটাকে কেন্দ্র করে গণআন্দোলনের সূচনা হয় ২১ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সনে ঢাকায় ভাষার দাবিতে ছাত্ররা মিছিল করে। উক্ত মিছিলে পুলিশের গুলীতে ছাত্র মারা গেছে, সালাম, বরকত শহীদ হয়েছে এই সংবাদ রাজধানী ঢাকা থেকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে গ্রামাঞ্চলেও।

আমরা ক্লাস করছি। হঠাৎ সাঁথিয়া হাইস্কুল থেকে একটি মিছিল এসে পৌঁছল আমাদের মাদরাসা মাঠে। উক্ত মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন আমাদের

www.pathagar.com

সাঁথিয়া থানার ঐ সব ছাত্ররা যারা তখন পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে পড়া-শুনা করছেন। এদের একজন ছিলেন আমাদের ইউনিয়নের তেতুলিয়া গ্রামের তাছিল উদ্দীন অন্যজন ছিলেন গৌরী গ্রামের জয়নুল আবেদীন খান। এ ছাড়া আরো অনেকেই ছিলেন। যাদের নাম এই মুহূর্তে স্মরণ করতে পারছি না। মিছিল মাঠে এসে দাঁড়াল। মিছিল থেকে কয়েকজন বিভিন্ন ক্লাসে গিয়ে বলল ঢাকায় ছাত্র নিহত হচ্ছে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে। প্রতিবাদে আমরা মিছিল করছি। এই মিছিলে আপনারাও শরীক হোন। আমরা দ্রুত সময়ের মধ্যে উক্ত মিছিলে শামিল হলাম। মিছিল সাঁথিয়ার বোয়ালমারীর বাজারসহ গ্রামের পথেও কিছুক্ষণ চলতে থাকে। সেই মিছিলের শ্লোগান যা এখনও মনে আছে, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। নূরুল আমিনের বিচার চাই, নাজিমুদ্দীনের বিচার চাই। মিছিলে কাল ব্যাজও ছিল কলেজ থেকে আগত ছাত্রনেতাদের বুকে।

মিছিল শেষে সাঁথিয়ায় হাইস্কুলে শোক সভা হল। কলেজের ছাত্র নেতাদের পক্ষ থেকে নিহত বা শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে জন্যে এক মিনিট নিরবতা পালনের আহ্বান জানানো হল। এটা গ্রামের ছাত্রদের জন্যে ছিল নতুন অভিজ্ঞতা। এক মিনিটের নিরবতা ভাংগল অনেক ছাত্র নেতার হাসাহাসির মধ্য দিয়ে। তাদের মুখের সেই ভঙ্গিমা এখন আমার চোখের সামনে। নেতারাই যখন নিরবতা ভাংগল হাসাহাসির মাধ্যমে তখন অন্যদের তো আর কিছু করারই ছিল না। আমরা যারা মাদরাসার ছাত্র হিসাবে সেখানে উপস্থিত ছিলাম, তারা হাইস্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রদের চেয়েও কম বয়সের। কলেজের ছাত্র নেতাদের চেয়ে তো আরো অনেক ছোট। তাই সেখানে মৃত বা নিহত ব্যক্তিদের জন্যে এভাবে নিরবতার পরিবর্তে দোয়ার প্রস্তাব দেয়ার মত পরিবেশই ছিল না।

ঢাকায় ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে মিছিল আরো বেশ কদিন ধরে চলতে থাকে। এরমধ্যে একদিনের মিছিল সাঁথিয়া থানার ওসি পুলিশ বাহিনীকে মিছিলে গুলির ভয় দেখিয়েছিলেন না নির্দেশ দিয়েছিলেন বিষয়টি আমার কাছে পরিষ্কার ছিল না। কারণ ঠিক ঐ সময়টায় ওখানে আমি উপস্থিত ছিলাম না। পরে আমি যখন পৌঁছি তখন হাইস্কুলে মিটিং ছিল। মিটিং বক্তৃতাকালে পাবনা এডওয়ার্ডের অন্যতম ছাত্র আমার বড় ভগ্নিপতির ছোট ভাই বলে

www.pathagar.com

ফেললেন আবার পুলিশ আসছে না তো। তখন আমার মনে প্রশ্ন জনগণ এ কথা বলছেন কেন। তখন জানলাম যে, হাইস্কুল থেকে মিছিল নিয়ে ছাত্ররা যখন রাস্তা পার হয়ে বোয়ালমারী বাজারের দিক মানে আমাদের মাদরাসার দিকে রওয়ানা দেয় তখন সাঁথিয়া থানার ওসি পুলিশকে নির্দেশ দিয়ে বলে "লোড, লোড" এর অর্থ তো গুলী করা বুঝায় না বন্ধুকে গুলী ভরতে বলাই বুঝায়। বন্ধুকে গুলী ভরার অর্ডার শুনে পুলিশ বন্দুক উঁচিয়ে গুলী করার চেষ্টা করতেই মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে স্কুলের মধ্যে গিয়ে জড়ো হয়ে প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়।

ঐ বছরেই সম্ভবত এই ঘটনার মাস দুয়েক পরেই সাঁথিয়া হাইস্কুলের হেড মাস্টার সাহেবের বড় ভাইয়ের বড় মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে এই গুলীর আদেশ আলোচনায় স্থান পায়। হেড মাস্টার সাহেব নিজেই কথা প্রসঙ্গে বললেন এই তো সাঁথিয়াতেও আমার ছাত্রদের উপরও গুলী করতে যাচ্ছিল পুলিশ। এই বিয়ের অনুষ্ঠানটিও ছিল একটি ব্যতিক্রম-ধর্মী অনুষ্ঠান এবং তদানীন্তন সামাজিকতার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। সাঁথিয়া হাইস্কুলের সে সময়ের হেড মাস্টার ছিলেন জনাব খুরশীদ আলম সাহেব। আমাদের নিকট-আত্মীয় এবং পাশের গ্রামের বাসিন্দা। তাদের বাড়ি আর আমাদের বাড়ির ব্যবধান এক কিলোমিটারের বেশি হবে না। তাদের বাড়ির সাথে লাগানো আমাদের আব্বা চাচাদের জমি।

হেড মাস্টার সাহেবের বড় ভাইয়ের মেয়ের বিয়েতে তার প্রাক্তন ছাত্রদের এবং বর্তমান ছাত্রদের অনেককেই দাওয়াত করা হয় এবং তারা বেশ কয়েকদিন ঐ বাড়িতেই অবস্থান করে বেশ আনন্দ উল্লাসে পরিবেশটাকে মাতিয়ে রাখেন। হেড মাস্টার সাহেবের এক ভাই আমার ভগ্নিপতি হবার কারণে ঐ অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমাকেও ঐ বাড়িতে থাকতে হয় বেশ ক'দিন। হাইস্কুলের ৯ম-১০ম শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় ছাত্রদেরও প্রায় সবাই আমাদের আত্মীয়। কলেজ থেকে আগতরাও আত্মীয়দের মধ্যে পড়ে এবং তারা সবাই ছাত্রনেতা, তখন রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িত। আমি তাদের সাথে সামিল হই সর্বকনিষ্ঠ হিসাবে। সাঁথিয়া হাইস্কুলের হেড মাস্টার সাহেবের ভাতিজার বিয়ের এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে স্কুল এবং কলেজের ছাত্রনেতাদের এই গ্রুপটি তাদের বাড়িতে বেশ কয়েকদিন

www.pathagar.com

অবস্থান করে। বিয়ের আগের দিন তারা বিয়ে বাড়ি সাজানোর কাজ আঞ্জাম দেয়। বিয়ের ২/১ দিন পরে বরের বাড়িতে যে অনুষ্ঠানটি হয় সেখানেও সবাই দল বেঁধে যায়। হেড মাস্টার সাহেবের নিকট আত্মীয় হিসাবে আমিও তাদের সাথী হিসাবে সেখানে যাই। তাদের ঐ গ্রুপের মধ্যে আলোচনায় তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা হত বেশি। তাদের সর্বকনিষ্ঠ সাথী হিসাবে আমি কোন কথাবার্তায় অংশ না নিলেও মনোযোগ দিয়ে তাদের কথাগুলো শুনতাম। তাদের একজন একদিন আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করল, পরিচয় পেলে বলল এই জন্যেই তোমার মত বয়সের ছেলে আমাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছ। আসলে তাল মিলানোর ব্যাপার ছিল না। দেশের রাজনীতি সম্পর্কে জানার আগ্রহটা ছিল আমার স্বভাবের অংশ। তাদের অনেকের কথাবার্তা আমার অপছন্দ হত। তারপরও ঐ পরিবেশটা আমার জন্যে স্মরণীয় হয়ে আছে।

১৯৫৩ সনে আমি বোয়ালমারী মাদরাসায় সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। এ বছরের শুরুর দিকে পাবনার মুসলিম লীগ সরকারের কোন একজন মন্ত্রী এসেছিলেন সফরে। তার সভায় কলেজের ছেলেরা বাধা প্রদান করায় পুলিশের সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষ হয়। শুনেছিলাম পাবনার স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতা ডাঃ তোফাজ্জল সাহেবের বাড়ি থেকে নাকি ছাত্রদের লক্ষ্য করে গুলীও করা হয়েছিল। ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই করার কোন সুযোগ ছিল না। কোন হতাহতের ঘটনাও ঘটে নাই। তবে একটা গোলমাল হয়েছিল এটা সত্য। পরের দিনই প্রতিবাদের জন্যে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের ছাত্র নেতারা সাঁথিয়ায় আসেন এবং প্রথা অনুযায়ী হাইস্কুল ও মাদরাসার ছাত্রদের নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল করেন। এভাবেই আমরা রাজনৈতিক মিছিল মিটিং এ পর্যায়ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে উঠি।

১৯৫৪ সন একটি ঐতিহাসিক বছর। এই বছরেই শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী সাহেব এবং মাওলানা আতাহার আলী সাহেবের নেতৃত্বে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট। আমি এবার মাদরাসায় অষ্টম শ্রেণীতে উঠেছি মাত্র। ঘটনাক্রমে বছরের ১ম দিন ক্লাসে যেতে পথেই শরীরে জ্বর-জ্বর অনুভব করলাম। ক্লাসে বেশিক্ষণ থাকা হল না। চলে গেলাম নানা বাড়িতে। মা খবর পেয়েই চলে আসলেন এবং ঐ

www.pathagar.com

দিনই আমাকে নিয়ে এলেন গ্রামের বাড়িতে। জ্বরটা আমাকে কেন যেন বেশ ভোগায়। বছরের শুরুতেই মাস খানেকের মত ক্লাস করতে পারলাম না। শুধু জ্বরের কারণে কেন যে এমন অবস্থা হল তখনও বুঝিনি এখনও বুঝে আসে না। তখন মাদরাসায় দাখিল পরীক্ষা হত অষ্টম শ্রেণী থেকেই। আবার এই বছরটাই নির্বাচনের বছরও। আমি অসুস্থ অবস্থায় বাড়িতে দিন কাটাচ্ছি। ক্লাসের পড়াশোনাও করতে পারছি না। দেশে নির্বাচনী জোয়ার উঠেছে তাতেও অংশ নিতে পারছি না এটা আমার জন্যে ছিল সত্যি একটা কষ্টের সময়।

একদিন দুপুরে জ্বরের প্রকোপে আমি নাকি ভুল বকতে থাকি। বড় চাচাকে আমাকে দেখার জন্যে ডেকে আনতে বলি। বড় চাচা ডাক্তার চাচা সবাই আসেন। আমাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত। মা সাংঘাতিকভাবে বিচলিত হয়ে পড়েন। আব্বা অবশ্য সব সময়ই বেশ শক্ত মনের ছিলেন। আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাসের বলে অবিচল থাকতেন। মায়ের অস্থিরতার কথাটা ঐ অবস্থার মধ্যেও কেন যেন আমি বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করতে থাকি, ফলে আমার অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। মাঝ খানে অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। কী হয়েছে কিছুই মনে নেই। চেতনা ফিরে পেয়ে তাকিয়ে দেখি আমার মাথায় পানি ঢালতে ঢালতে বাড়ির ভেতরে উঠানটা প্রায় বন্যার পানিতে ভাসমান মনে হল। পাশে বড় চাচা ডাক্তার চাচাসহ বাড়ির মুরুব্বীদের সবাইকে দেখলাম আমার চারদিকে বসে আমাকে সুস্থ করে তোলার জন্যে চেষ্টা করছেন, আর আল্লাহর কাছে দোআ করছেন।

এই অসুখের ফলে বছরের তিন মাস পড়াশোনা কিছুই করা সম্ভব হয়নি। যখন কিছুটা সুস্থতাবোধ করে চলাফেরা শুরু করছি তখন দেশ ভাসছিল নির্বাচনী জোয়ারে।

বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে চাপিয়ে দেবার অপপ্রয়াস ছিল পাকিস্তানের প্রথম ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের মারাত্মক ভুল, যা পরিণামে পাকিস্তান নামক দেশটির ভিত্তিমূলে আঘাত হানে। পাকিস্তান ছিল বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম দেশ, যা অর্জিত হয়েছিল ইসলামের নামে, শাসকগোষ্ঠীর অপরিণামদর্শিতা ও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি ন্যায় ইনসাফ ভিত্তিক আচরণে ব্যর্থতার ফলে দেশটিকে

www.pathagar.com

চরমমূল্য দিতে হয় অত্যন্ত মর্মান্তিক পরিণতির মাধ্যমে। তার সূচনা হয় ১৯৫৪ সনে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের শোচনীয় পরাজয়ের মাধ্যমে।

আমাদের এলাকায় মুসলিম লীগের প্রার্থী ছিলেন একজন ভাল, ভদ্র ও সৎ মানুষ। তিনি আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। বড় চাচা আফসোস করে বললেন, লোকটা যদি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াতো তাহলে আমি তার জন্যে কাজ করতাম।

ঘটনাক্রমে আমাদের এলাকা থেকে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা শাহজাদপুর থেকে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে দুজন দাবি করে বসেন। ফলে বেশ সমস্যা হল। আমাদের সাঁথিয়া বেড়া থেকে নেজামে ইসলামের পক্ষ থেকে যুক্তফ্রন্টের নমিনি হিসাবে দাবি করলেন মাওলানা আব্দুল হামিদ সাহেব। যিনি আমাদের মাদরাসার ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারীও ছিলেন। অপর দিকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যুক্তফ্রন্টের নমিনি হিসাবে দাবি করলেন মির্জা আব্দুল আউয়াল সাহেব। নির্বাচনী এলাকার বৃহৎ অংশ সাঁথিয়ার গোটা থানা আর ক্ষুদ্র অংশ বেড়ার মাত্র তিনটি ইউনিয়ন। মাওলানা আব্দুল হামিদ সাহেব সাঁথিয়ার লোক হবার কারণে সাঁথিয়াবাসীর আবেগ জড়িত সমর্থন তার প্রতি থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। মির্জা আব্দুল আউয়াল সাহেবের বাড়ি বেড়ার শেষ প্রান্তে হবার কারণে সাঁথিয়া বাসীর সমর্থন না পাওয়ারই কথা। অবস্থা সামাল দেয়ার জন্যে যুক্তফ্রন্ট নেতা ও আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে আনার সিদ্ধান্ত হল সাঁথিয়ায়। ক'দিন আগে পাশের এলাকায় মাওলানা ভাসানী সাহেব এসে নেজামে ইসলামের প্রার্থী মাওলানা সাইফুদ্দীন ইয়াহইয়া সাহেবের বিপক্ষে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে বক্তব্য দিয়ে গেছেন। সাঁথিয়াতে এসে সোহওয়ার্দী সাহেব তাই করবেন এটা বুঝতে কারও বাকী থাকল না। দিন তারিখটা মন নেই। তবে দৃশ্যটা এখনও মনে পড়ে। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের জন্যে সভার স্টেজ করা হয় বোয়ালমারী মাদরাসার মাঠের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে, বোয়ালমারী হাটের ফাঁকা জায়াগায়। আর মাওলানা আব্দুল হামিদ সাহেবের জন্যে স্টেজ করা হয় একই মাদরাসার মাঠের উত্তরে মাদরাসার বারান্দা সংলগ্ন স্থানে। সোহরাওয়ার্দী সাহেব আসতে বেশ বিলম্ব

www.pathagar.com

হয়। ততক্ষণে পাশাপাশি দুটি সমাবেশই চলতে থাকে। তবে কোন রকমের অপ্রীতিকর কিছু ঘটে নাই।

সোহরাওয়ার্দী সাহেবের আসতে বিলম্ব হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের ছাত্র নেতারাই সমাবেশটা বেশ জমজমাট করে রাখেন। দুপুরের দিকে সোহরাওয়ার্দী সাহেব এসে পৌঁছছেন বলে খবর প্রচার হলেও তখনও মঞ্চে এসে পৌঁছেননি। শোনা গেল গাড়ীটা হাইস্কুল ও বাজারের মাঝখানে নিচু জায়গায় আটকে গেছে। সোহরাওয়ার্দী সাহেব ভীষণ রেগে গেছেন। ফিরে যেতে জেদ ধরেছেন। তার সেক্রেটারী এসে মির্জা আব্দুল আউয়াল সাহেবকে কানে কানে কি যেন বললেন। সাথে সাথে ছাত্রদের একটি দল দৌড়ে গেল গাড়ীটা টেনে আনতে। ছাত্রদের দৌড়ের রহস্য বোঝার জন্যে আমি তাদের সাথী হয়ে যাই এবং সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে একান্ত কাছে থেকে দেখতে পাই। তিনি গাড়ী থেকে নেমে পায়চারী করছিলেন এবং রাগে গড় গড় করছিলেন।

যাক, অবশেষে সোহরাওয়ার্দী সাহেব মঞ্চে এলেন ২/৩ মিনিট এর উর্দু বাংলা মিশ্রিত ভাষায় বললেন, মুসলিম লীগকে পরাজিত করার জন্য যুক্তফ্রন্ট করা হয়েছে। আমাদের প্রতীক নৌকা। শুনেছি কোন এক মৌলভী সাহেব এখানে যুক্তফ্রন্টের নমিনি। যারা এটা করেছেন সেটা ঠিক না। আপনারা মিয়া আব্দুল আউয়াল সাহেবকে নৌকা মার্কায় ভোট দিবেন। তিনি মাওলানা আব্দুল হামিদ সাহেবকে ডেকে নিলেন এবং তাকে বসে যেতে অনুরোধ করলেন। বললেন এবার আমার কথা রাখুন। আগামীতে আপনার কথাটা আমি বিবেচনায় রাখব।

আমি ফটকেই দাঁড়িয়েছিলাম। মির্জা আব্দুল আউয়াল সাহেবের পিতাকে দেখলাম সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সাথে পরিচয় করার জন্যে এগিয়ে আসতে। এই সুযোগে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের হাতে পাঁচশত টাকার কিছু নোট তুলে দিলেন সম্ভবত যুক্তফ্রন্টের কেন্দ্রীয় নির্বাচনী ফান্ডের জন্যে।

নির্বাচনী ফলাফল যা হবার তাই হল। মির্জা সাহেব পেলেন ৫৪ হাজার ভোট। আর সাঁথিয়ার একমাত্র প্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও মাওলানা আঃ হামিদ সাহেব পেলেন মাত্র দুই হাজার আটশত ভোট। এটা ছিল মুসলিম লীগের প্রতি অনাস্থার বহিঃপ্রকাশ। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল

www.pathagar.com

আমিন যিনি' ৭০ এর জোয়ারের সময়ও আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে পরাজিত করে এম. এন. এ নির্বাচিত হয়েছিলেন' ৫৪ তে হেরেছিলেন একজন অপরিচিত ছাত্রের কাছে। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলেও জাতি এর খুব একটা সুফল পেয়েছে বলে মনে করার কোন কারণ ছিল না। অজ-পাড়া গ্রাম থেকে অবস্থার সঠিক বিবরণী জানা আমার পক্ষে সেই সময়ে, সেই বয়সে মোটেও সম্ভব ছিল না। নতুন প্রাদেশিক সরকার গঠনের অল্প দিনের ব্যবধানেই '৯২ এর 'ক' ধারা জারি করে রাজনীতিতে নতুন জটিলতা সৃষ্টি করে তদানীন্তন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার।

'৫৪ এর নির্বাচনের পরে অল্প ব্যবধানেই ঐ বছরের মাহে-রমযানের রোজা শুরু হয়। একেবারেই পহেলা জৈষ্ঠ্য থেকে। এ সময় বড় দিন এবং প্রচণ্ড খরা বা দাবদাহ। এটাই ছিল আমাদের জীবনের প্রথম পূর্ণ মাস ব্যাপী রোজা পালন ও তারাবিহতে অংশ গ্রহণ। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে কোন কোন দিন দুবার এমনকি তিন বারও গোসল করেছি। দুপুরটা কাটিয়েছি আমতলায় পাটি বিছিয়ে বিশ্রাম নিয়ে। এই রোজা শেষে ঈদের মাঠে আমাদের একজন চাচাতো ভাই বক্তৃতায় '৯২-ক ধারা জারির ও জনগণের নির্বাচিত প্রাদেশিক সরকার ভেঙ্গে দেয়ার কড়া সমালোচনা করে বক্তৃতা করলেন। পরে জেনেছি ওর পেছনে কিছু ঘটনা ছিল। যার একটি ছিল যুক্তফ্রন্টের শরীক দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং এটাই ছিল প্রধান। শেরেবাংলা ফজলুল হক সাহেবের কৃষক-শ্রমিক-প্রজা পার্টির সরকারকে ব্যর্থ করার জন্যে ভেতর থেকেই বাংগালী-বিহারী দাঙ্গার সৃষ্টি করে একটা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রয়াস পায়। অপর দিকে ভুয়া মিছিল বের করে আরো একটা অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়। যেটাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেই জারি করা হয় '৯২ এর 'ক' ধারা। তখন এত সব বোঝার বুদ্ধি আমার ছিল না। শুধু মুরুব্বীদের মুখে শুনতাম এত কষ্ট করে নৌকায় ভোট দিয়ে যুক্তফ্রন্টকে বিজয়ী করে কী লাভ হল?

আগেই বলেছি '৫৪ সনটি ছিল আমার দাখিল পরীক্ষার প্রস্তুতির বছর। যে পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৫ সালে। ৫৪ এর প্রথম ভাগ আমার অসুস্থতা

www.pathagar.com

আর নির্বাচনের মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হয়। ১৯৫৫ তে সিরাজগঞ্জ আলিয়া মাদরাসা কেন্দ্রে দাখিল পরীক্ষায় অংশ নিলাম। (তখন এ পরীক্ষা হয় অষ্টম শ্রেণী থেকে) বয়স কম থাকার কারণে এবং স্বভাব প্রকৃতিতে বেশ কিছুটা চঞ্চলতা বা অস্থিরতা থাকার কারণে পরীক্ষা যতটা ভাল হবার কথা, ততটা হল না বলেই মনে হয়। জীবনের প্রথম শহরে যাওয়া। নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপখাওয়াতে না পারা এবং দ্রুত উত্তর লিখে সময়ের বেশ আগে শেষ করে হল থেকে বের হয়ে আসা পরিবার ও শিক্ষকগণও পছন্দ করতো না। কিন্তু আমার স্বভাবগত কারণে ধীরস্থিরভাবে পরীক্ষা দেয়া হয়ে উঠেনি। পরীক্ষার ফল প্রাথমিকভাবে যা শুনলাম তাতে ১ম বিভাগ পেয়েছি জেনেই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। কিছু দিন পরে মাদরাসা বোর্ডের গেজেটে দেখা গেল আমার নামের পাশে ৬১ লেখা এর অর্থ মেধা তালিকায় আমার ক্রমিক নম্বর ৬১। আগের বছর পর্যন্ত দাখিল পরীক্ষায় ৬৬ জন বৃত্তি পেয়েছিল। তাই আমি বৃত্তি পেয়ে যাব এটা বেশ প্রচার হয়ে গেল। অবশ্য পরে জানা গেল ঐ বছর থেকে বৃত্তির সংখ্যা কমানো হয়। ফলে বৃত্তি আর পাইনি। তবে আমার নিজের প্রতি কিছুটা অনুযোগ থেকে গেল। চঞ্চলতা ও অস্থিরতা পরিহার করতে পারলে বোধ হয় আরো একটু ভাল করা যেত। বোয়ালমারী মাদরাসা তখনও দাখিল পর্যন্তই ছিল।

তাই পরবর্তীতে কোথায় ভর্তি হওয়া যায় এ নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে পরামর্শ হল। তখনকার দিনে পাবনার তিনটি মাদ্রাসার সুনাম ছিল। একটি চাটমহর থানায় হাদল সিনিয়র মাদরাসা, একটি আটঘরিয়া থানায় ইসলামীয়া সিনিয়র মাদরাসা শিবপুর আরেকটি পাবনা সদর থানায়। পুষ্প পাড়া মাদরাসাটি নগরবাড়ী পাবনা রোড সংলগ্ন। আমাদের পাশের গ্রামের মাওলানা নিজামুদ্দিন সাহেব ওখানকার শিক্ষক। বোয়ালমারী গ্রামের রুস্তম আলী সাহেবও ওখানে শিক্ষকতা করেন। এই সব দিক বিচার করে পুষ্পপাড়াতেই ভর্তি হবার নিয়ত করে রওয়ানা দিলাম। সাথে ছিলেন আমার নানাবাড়ীর গ্রামের আবুল কাসেম মামা। সাঁথিয়া গ্রামের নানার বাড়ী যে জেনারেশনের সবাইকে নানা বলতাম আর আমাদের সব বয়সী যে প্রজন্মের সবাইকে মামা বলতাম, আমি তাদের সকলের আদরের এবং স্নেহের পাত্র ছিলাম। যা আজও পরম তৃপ্তির সাথে স্মরণ করি। উক্ত মাদরাসায় ভর্তির উদ্দেশে রওয়ানাকালে বড় চাচা আমাদের পাশের গ্রামের

www.pathagar.com

(সেমাতালীর) মাওলানা নিজামুদ্দীন সাহেবের কাছে একটা চিঠিও দিয়েছিলাম। বেচারা কেন যেন চিঠিটার উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না। চিঠির গুরুত্ব দিয়ে আমার ব্যাপারে বিশেষ কোন কেয়ার নিলেন বলেও মনে হল না। ভর্তি না হয়ে অভিভাবকদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা বলে বাড়িতে ফিরে গেলাম।

সাঁথিয়া থেকে পাবনার দূরত্ব ২১ মাইল আর পুষ্প পাড়া থেকে পাবনার দূরত্ব ৭/৮ মাইল। তখনকার ঐ বয়সে পুরো পথ হেঁটেই গিয়েছিলাম এবং হেঁটেই এসেছি। ফিরে আসার দিন পথ আর শেষ হচ্ছিল না। চেনা জানা পথ তাও প্রবোধ দেয়ার জন্যে মানুষের কাছে জানতে চাইতাম সাঁথিয়া আর কতদূর। এখনও মনে পড়ে কয়েক দিন পায়ে ব্যথা অনুভব করেছি। বাড়ী ফিরে যাবার পর বড় চাচা জানতে চাইলেন মাওলানা নিজামুদ্দিন সাহেব তার চিঠির উত্তরে কিছু লিখেছেন বা বলেছিল কিনা। চিঠির উত্তর না পেয়ে তিনি বেশ দুঃখবোধ করলেন। পরে বড় চাচার একজন পরিচিত আলেম শিবপুর মাদরাসা শিক্ষক মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেবকে একটা চিঠি দিয়ে আমাকে শিবপুর মাদরাসায় পাঠালেন। চাচার উপদেশের প্রধান বিষয় ছিল উস্তাদদের সাথে যেন সবসময় ভাল ব্যবহার করি। আদবের সাথে তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে চলি।

মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব (সেই সময়ের একজন ভাল ওয়ায়েজ ও মুফাসসিরে কুরআন) বড় চাচার চিঠি যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেন, সম্মান দেখালেন। শিবপুর মাদরাসার প্রবীণতম শিক্ষক মুফতী ছগীর আহমদ সাহেবও বড় চাচার পরিচিত ছিলেন। তাকে বড় চাচার কথা বলায় তিনিও খুবই গুরুত্ব দিলেন। এখানকার পরিবেশ আমার কাছে যথেষ্ট আন্তরিকতাপূর্ণ মনে হওয়ায় আল্লাহর উপর ভরসা করে এখানেই ভর্তি হয়ে গেলাম। এখানে ভর্তির ক'দিন পরেই গেজেটে আমার নামের পাশে মেধা তালিকার চিহ্ন থাকায় ছাত্র ও শিক্ষকদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট গুরুত্বও পেলাম।

১৯৫৫ সনের জুলাই এর দিকেই সম্ভবত আমার শিক্ষা জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল তা ইসলামীয়া সিনিয়র মাদরাসা শিবপুর সম্পূর্ণ অজানা অচেনা নতুন পরিবেশে। মাদরাসাটি ইছামতি নদীর তীরে অবস্থিত। তবে

www.pathagar.com

আমাদের গ্রামের কাছ বা আমাদের এলাকার অন্যান্য গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ইছামতি। আর এ ইছামতি একই নদী হলেও এখানে এটাকে বেশ সরু মনে হয়েছে। এখানেও এই ইছামতিতেই গোসল করতে হয়েছে। যখন পানি একেবারে কমে যেত তখন মাদরাসার টিউবওয়েলেই গোসলের কাজ সারতে হত। এ মাদরাসায় পাঠরত স্থানীয় ছাত্র ছাড়া বাকীরা ফ্রি বোর্ডিংয়ে খাওয়া দাওয়া করে। তবে থাকার কোন আলাদা জায়গা ছিল না। মাদরাসার বিল্ডিংয়ের কমন রুমের মধ্যেই এর কোন রকমে মাথা গুঁজে থাকত। আমার মাত্র ২/৩ দিন ফ্রি বেডিংয়ে থাকতে হয়েছে এবং মাদরাসার রুমে থাকতে হয়েছে। এরপরই মাদ্রাসার সন্নিকটে ৪/৫ মিনিট হাঁটা পথ অতিক্রম করলেই যে বাড়িটি পাওয়া যায় সেই বাড়িতে জায়গীর হয়। তাদের ছোট ২/৩টি বাচ্চাকে পড়াতে হত। ঐ বাড়িতেই একজন মাদরাসার ছাত্র থাকত আমার এক ক্লাস নীচের। এটা ছিল তার নানা বাড়ি। তার জন্যে আমার যথেষ্ট সহায়তা পাওয়া সম্ভব হয় এখানে।

আমাদের সময় আলেম ক্লাসের জন্যে ৪টি বছর লাগত। আলিম ফাইনাল পরীক্ষার কোর্স অবশ্য দু'বছরেরই ছিল, আলিম তৃতীয় বর্ষ ও চতুর্থ বর্ষ। আলিম ১ম ও ২য় বর্ষের জন্যে কোন পাবলিক একজামিনেশনের ব্যবস্থা ছিল না। তবে কুরআন শরীফের তরজমা পড়া শুরু হয় আলিম ১ম বর্ষ থেকেই যা শেষ হয় আলিম চতুর্থ বর্ষে গিয়ে। কুরআন শরীফের শেষই ছিল আলিমের কোর্সের অন্তর্ভুক্ত। যা পড়তে হত আলিম তৃতীয় ও চতুর্থ বছরে। আমার কাছে এটা একটা সুন্দর ব্যবস্থা মনে হয়েছে। আমাদের হাদিসের পাঠ শুরু হয় আলিম তৃতীয় বর্ষ থেকে। মেশকাত শরীফ সহীহ হাদিস সমূহের একটি চমৎকার সংকলন। আলিম ও ফাজিল মিলে এর পুরোটাই পড়ার কথা। অবশ্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেটা সম্ভব হয়ে উঠত না। তবে হাদিস শাস্ত্র সম্পর্কে আলিম ও ফাজিল মিলে মোট চার বছরে একটা ভাল ধারণা হয়ে যাবার কথা। যারা আন্তরিকতার সাথে মেশকাত অধ্যয়ন করে তাদের জন্যে হাদিসের অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যয়নের দ্বারা খুলে যায় এবং বেশ সহজ সাধ্য হয়ে যায়। এখানে আলিম ১ম বর্ষে আমার সহপাঠীদের মধ্যে গেজেটে প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী আমাকেই ক্লাসের সেরা ছাত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যা আমার নিজের কাছেও বেশ বিব্রতকর মন হত।

www.pathagar.com

তবে এ অসিলায় শিক্ষক মহোদয়গণের স্নেহের দৃষ্টি এবং ছাত্র বন্ধুদের বন্ধুসুলভ আচরণ আমাকে বেশ উৎসাহিত করে। শিবপুর মাদরাসায় আমার আলিম ও ফাজিল মিলে মোট ছয়টি বছর কেটে যায় খুবই অন্তরঙ্গ পরিবেশে। আমি যখন আলিম ১ম বর্ষে তখন আমার উপরের ক্লাসের অর্থাৎ আলিম ২য় বর্ষ থেকে নিয়ে ফাজিল ২য় বর্ষ পর্যন্ত সিনিয়র ছাত্রদের সাথেও বেশ সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। আবার একই সাথে নিচের ক্লাসের ছাত্রদের সাথেও গড়ে উঠে সুন্দর সম্পর্ক। যা ভাবতে আমার এখনও বেশ অবাক লাগে। মাদরাসার ছাত্র শিক্ষকদের সাথে স্নেহ মায়া-মমতা ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে উঠার পাশাপাশি মাদরাসার আশপাশের কয়েকটি গ্রামের মুরুব্বী এবং যুবকদের সাথেও আমার গড়ে উঠে এক অদ্ভুত সুসম্পর্ক। যা আমি এখনও হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করি। ফাজিল পাসের পর ঢাকার উদ্দেশে বিদায় নিতে গিয়ে ইছামতি পাড় হতেই অঝোরে কান্না পায়। ফেলে আসা দৃশ্য ভেসে উঠে আমার মানস-পটে। জন্ম দেয় এক বিরল অনুভূতির। আমার জীবনের সর্বোত্তম সময় ছিল শিবপুর মাদরাসায় অধ্যয়নকালে সেই ছয়টি সোনালী বছর। বোয়ালমারী মাদরাসায় পড়ার সময় সাঁথিয়া থানার সদরে থাকার কারণে মাদরাসার গণ্ডির বাইরে রাজনীতি ও সংস্কৃতির অঙ্গনের কিছু খোঁজ-খবর রাখার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। সাঁথিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের অফিসে একটা দৈনিক পত্রিকা আসত। আজাদ নামের ঐ পত্রিকাটি নানা সাথে করে বাড়িতে আনতেন। ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার হিসাবে আমাদের গ্রামের বাড়িতে বড় চাচার কাছে আসত অর্ধসাপ্তাহিক পাকিস্তান পত্রিকাটি, এই দুটো পত্রিকা অর্থাৎ একটি দৈনিক আর একটি অর্ধসাপ্তাহিক পত্রিকার আমি ছিলাম মোটামুটি নিয়মিত পাঠক। বাড়ি গেলে অর্ধসাপ্তাহিক পাকিস্তান আর নানা বাড়ি থাকলে দৈনিক আজাদ পড়ার সুযোগ আমি কখনও হাত ছাড়া করতাম না। শিবপুরে যাওয়ার পর দেখলাম এটা বড় মাদরাসা হলেও অজ-পাড়া গায়ে অবস্থিত। মাদরাসা থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে একদণ্ড বাজার। ঐ বাজারেই মাদরাসার পোস্ট অফিস। মাদরাসায় দৈনিক আজাদ পত্রিকাটা রাখা হত। তবে দৈনিক পত্রিকা দিনে পাওয়া যেতো না। আমি চঞ্চল প্রকৃতির হবার কারণে পত্রিকা আগে পাওয়ার উদ্দেশ্যে এক দৌড়ে বাজারে পোস্ট অফিসে গিয়ে পত্রিকা মাদরাসায় নিয়ে আসার নাম করে আগে পড়ে নিতাম।

www.pathagar.com

শিবপুর মাদরাসা অজ-পাড়াগাঁয়ে অবস্থিত হলেও এ মাদরাসার ছাত্র শিক্ষকদের অনেককেই বেশ রাজনৈতিকভাবে সচেতন মনে হয়েছে। শিবপুর গ্রামটা বেশ ধনী লোকদের বসবাস। ব্যবসায়ী হবার কারণে প্রায় প্রতিদিনই গাঁয়ের কেউ-না-কেউ পাবনা জেলা শহরে যাতায়াত করে থাকেন। পাবনার ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিশেষ ধনী গাছীর কাজী পরিবার বৈবাহিক সূত্রে শিবপুরের প্রভাবশালী ব্যক্তি জাবেদ আলী সরকারের জামাতারা কয়েক ভাই। মাদরাসায় ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারীর পদটি সাধারণত এ পরিবারের জন্যে প্রায় সংরক্ষিত ছিল বললে অত্যুক্তি হবে না। মাদরাসার ছাত্রদের অধিকাংশ ছিল সে সময়ের নেজামে ইসলাম পার্টির সমর্থক। শিক্ষকদের মধ্যে মুসলিম লীগের ও কৃষক শ্রমিক-প্রজা-পার্টির সমর্থক ছাড়া বাকীরা ইসলামী রাজনৈতিক দলের সমর্থক। ছাত্রদের মধ্যে সোহরাওয়ার্দীর ভক্ত হিসেবে ২/১ জন আওয়ামী লীগের সমর্থকও ছিল। তবে ঐ সময়ে মাওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবের সমর্থক কাউকে দেখিনি। এই মাদরাসায় আমার শিক্ষা জীবন শুরু হবার অল্প কিছু দিনের মধ্যে আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। আতাউর রহমান খানের মন্ত্রীসভা শিক্ষানীতি দিতে গিয়ে মাদরাসা শিক্ষার বিরূপ সমলোচনা করে। শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়েই পাঁচ মাসের ব্যবস্থা রাখার প্রস্তাব করায় বিরূপ প্রক্রিয়া দেখা দেয়। বিশেষ করে যুক্তফ্রন্টের অন্যতম শরীক দল নেজামে ইসলাম পার্টি ছিল মূলত ওলামা প্রধান। তাই মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষকগণ বেশ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে। শিবপুর মাদরাসার ছাত্র শিক্ষকদের একটি প্রতিবাদ সভা হয়। শিক্ষকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ মুফতী ছগীর আহমদ হুজুর উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন।

শিক্ষকদের মধ্য থেকে কয়েকজন এবং ছাত্রদের অনেকেই পীড়াপীড়ি করলেও বক্তৃতা এড়িয়ে চলার প্রবণতাই ছিল আমার স্বভাব প্রকৃতির অংশ। আমি বন্ধু-বান্ধবদের বক্তৃতা লিখে দিয়েছি। পয়েন্ট নোট করে দিয়েছি। কিন্তু নিজে বক্তৃতা দেইনি। কিছুদিন ক্লাস করার পর কোন এক ছুটি উপলক্ষে বাড়ি এলাম। ছুটির সময়ে আমার গ্রামের বাড়িতে এবং সাঁথিয়ার নানা বাড়িতে দুই জায়গায় ভাগাভাগি করে সময় কাটাতে হত। সাঁথিয়ার

www.pathagar.com

প্রতি আকর্ষণটা একটু বেশী থাকার কারণ ছিল এটা থানা সদর হওয়া এবং সেই সাথে খেলাধুলাসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম কেন্দ্র স্থল হওয়া।

এক ভরা বর্ষাকালে ছুটিতে এসে নানা বাড়ি থাকা অবস্থায় সাঁথিয়া বেড়া এলাকায় এম.এল. এ জনাব মির্জা আব্দুল আউয়াল সাহেব এলেন সাঁথিয়ার আওয়ামী লীগ সরকারের সমর্থনে জনসভা করার জন্যে। উক্ত জনসভা অনুষ্ঠিত হয় বোয়ালমারী মাদরাসা মাঠে। সভার শুরুতে কুরআন তেলাওয়াতের দায়িত্বটা আমাকেই দেয়া হয়। যদিও আমি কোন ভাল ক্বারী ছিলাম না। উক্ত সভায় সাঁথিয়াবাসীর পক্ষ থেকে বেশ কিছু দাবি-দাওয়া করা হল। মির্জা সাহেব সেগুলো পাশ কাটিয়ে সেই সময়ের আলেমদের দাবি ইসলামী শাসনতন্ত্রের বিষয়টিকে তার বিরূপ সমালোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করলেন। আলেমদের বিরুদ্ধে বেশ অমার্জিত ভাষায় একতরফা সমালোচনা এনে বিষোদগার করে চললেন। এক পর্যায়ে তিনি মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.) সাহেবের নাম নিলেন খুবই ব্যঙ্গাত্মক ভাষায়। তার মতে তিনি নাকি একদল মুসলমানদেরকে কাফের ফতোয়া দেয়ার কারণে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরের দাঙ্গায় লাখ-লাখ লোক মারা যায়। এজন্যে মাওলানাকে সামরিক আদালতে ফাঁসির হুকুম দেয়া হয়। পরে নাকি তিনি মাফ চেয়ে জীবন ভিক্ষা চেয়ে অবশেষে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভুগছেন।

তার বক্তব্য ইসলামের প্রতি বিরূপ মনোভাব এবং আলেম ওলামার প্রতি বিদ্বেষের প্রকাশ দেখে আমি মনে মনে খুব বিক্ষুব্ধ হই। এমন একটা সভার শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করার জন্যে মনে মনে খুব দুঃখ, ক্ষোভ ও লজ্জা অনুভব করলাম। তবে এর ভেতর থেকে আমার জন্যে কল্যাণকর একটি দিক বেরিয়ে আসে। "কে ঐ মাওলানা মওদূদী?" এই প্রশ্নটা খুবই তীব্র হয়ে দেখা দিল আমার মনে। বাড়িতে আমার এক চাচাতো ভাইয়ের সাথে এবং তার কলেজ পড়ুয়া বন্ধুদের সাথে বেশ বিতর্ক হয়। ভাই অনুযোগ করে তার বন্ধুদের বললেন, এ আবার আমার সাথে ইসলামী ইস্যুতে বেশ তর্ক করে। আমি বিস্মিত হলাম যে কাদিয়ানী সম্প্রদায় মুহাম্মদ (সা.) কে শেষ নবী মানে না। মিথ্যা নবীর দাবিদারকে নবী মানে

www.pathagar.com

এবং যারা ঐ মিথ্যা ও ভণ্ড নবীকে নবী মানে তাদেরকে এই কলেজ পড়ুয়া ব্যক্তিরা মুসলমানদেরই একটি সম্প্রদায় মনে করে। মাওলানা মওদূদী তাদের বিরুদ্ধে বই লিখে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করছে, কোন যুক্তি প্রমাণ ছাড়া গায়ের জোরে এবং বয়সে বড় ও কলেজ পড়ুয়া হবার কারণে তাদের কথা মানতে বাধ্য করতে চায়। আমি স্বভাবের দিক দিয়ে ছোট বেলা থেকেই ভীষণ লাজুক প্রতিকৃতির হওয়া সত্ত্বেও তাদের এই পণ্ডিত মূর্খের ভাবভঙ্গিকে সহজে মেনে নিতে পারিনি। তাদের একজন আমাকে বুঝ দেয়ার জন্যে প্রমাণ হাজির করলেন। ইসলামে রাজনীতি যদি থাকতোই তাহলে ইমাম আবু হানিফা প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করলেন কেন? আমার পাল্টা প্রশ্ন ছিল এজন্যে তাকে কেন কারাগারে দেয়া হল এবং বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হল সেটা ভেবে দেখেছেন কি? তখন আমার ঐ চাচাতো ভাই বললেন দেখ আমি বলেছি না সে আমার সাথে তর্ক করে। একটু আগে বলছিলাম ঐ সভায় মির্জা সাহেবের মুখে মাওলানা মওদূদীর বিরূপ সমালোচনা শুনে লোকটাকে জানার জন্যে আমার মনে প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ইতোমধ্যে একদিন বইয়ের মলাটে পুরানো খবরের কাগজের দিকে নজর পড়ল। তাতে ছিল ছোট্ট একটি খবর "মাওলানা মওদূদীর মুক্তি চাই"। ঘটনাক্রমে ঐ সময় ঐ কাচারী ঘরে আমার চাচাতো ভাই মাহীর আব্দুল গণি ফকির ও উপস্থিত ছিলেন। বইয়ের মলাটের ঐ পুরানো খবরের কাগজের ঐ ছোট্ট খবরটি দেখিয়ে আমি মামাকে জিজ্ঞেস করলাম। আচ্ছা মামা বলুনতো ঐ মাওলানা মওদূদী লোকটি কে? স্মরণযোগ্য মির্জা আব্দুল আউয়াল এম.এল.এ সাহেব যে সভায় মাওলানা মওদূদীকে কটাক্ষ করে বক্তৃতা করেন সেখানে মামাও উপস্থিত ছিলেন। আমার প্রশ্নের পর মামা ধমক দিয়ে বললেন, বেটা তুমি মুসলমানদের এত বড় নেতা সম্পর্কে কিছু জাননা এটা কেমন কথা? তিনি তো মুসলিম জাহানের একটি বড় সম্পদ। মামা এর চেয়ে আর বেশী কিছু বললেন না। তবে আমার অজ্ঞতার জন্যে বেশ কিছুটা লজ্জা দিয়ে ছাড়লেন না। মির্জা সাহেবের বিরূপ মন্তব্যের ফলে যাকে জানার আগ্রহ আমি আমার কিশোর মনে লালন করছি তিনি ফাঁসির দণ্ড থেকে যাবজ্জীবনের কারাদণ্ড থেকেও মুক্তি পেয়েছেন ঐ বাসী খবরটাও ছিল বেশ সান্ত্বনার কারণ। সেই সাথে মামার মন্তব্য তিনি মুলসমানদের একজন বড়

www.pathagar.com

মাপের নেতা। তিনি মুসলিম জাহানের একটি মহামূল্যবান সম্পদ; এটা আমার মনের আগ্রহ আরো বাড়িয়েছিল মাওলানা মওদূদীকে জানার।

ইতঃপূর্বে বলে এসেছি আমার একটি অভ্যাস ছিল পুরোনো বই পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা ঘাঁটাঘাঁটি করা। আমাদের পারিবারিক লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আল ইসলাম ও মোহাম্মদীর ফাইল দেখার কথা বলেছি। এছাড়া আমাদের পরিবারের তিন চাচার ব্যক্তিগত সংগৃহীত বই পুস্তকও আমি অবাধে পড়াশোনা করতাম। এতে আমার কোন বাধা ছিল না। মাদরাসায় পড়ার কারণে ইতোমধ্যেই আরবী উর্দু পড়তে বুঝতে শুরু করেছি। বড় চাচার বই পুস্তকের মধ্যে হামদর্দ দাওয়াখানার একটি মাসিক ম্যাগাজিন পেলাম হামদর্দ নামে। এতে মূলত থাকত হামদর্দের ঔষধ পত্রের পরিচিতি ও গুণাগুণের বর্ণনা ও সেবন বিধির আলোচনা। আমার হাতের সংখ্যাটি মাহে রমযানের সংখ্যা হওয়ার কারণে এতে রোজার উপরে চমৎকার একটি প্রবন্ধ দেখলাম যার শিরোনাম ছিল রোজা আওর জাতে নফস লেখকের নাম সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী। আমার জন্যে এটা ছিল সোনার হরিণ হাতে পাওয়ার তুল্য একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

আমি প্রবন্ধটি পড়তে শুরু করলাম এবং প্রায় এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করলাম। এরপর আরো কয়েকবার পড়লাম। লেখাটা আমার কাছে কত যে ভাল লেগেছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ইতঃপূর্বে আমি ইমাম গাজ্জালীর কিমিয়ায়ে সাদাতের বাংলা অনুবাদ পড়েছিলাম। আমার কাছে মাওলানা মওদূদীর জ্ঞানের গভীরতা এর চেয়ে কোন অংশেই কম মনে হয়নি। বরং একটু বেশী মনে হয়েছে বললেও অতুক্তি হবে না। উল্লেখ করতে বাধা নেই এই সময়টাও ছিল রমযান মাস। রমযানের রোজা শেষে বড় চাচার ঈদের মাঠে আমাকে যেতে হয়েছে তার সাথে। তার নির্দেশে আমাকে ঈদের জামায়াতে বক্তৃতা করতে হল। আমি ঈদের দিনে রোজার শিক্ষা সারা বছর যেন ধারণ করতে পারি, এই মর্মে খুব অল্প কথায় বক্তব্য রাখি। যার পুরো ভিত্তি ছিল মাওলানা মওদূদীর ঐ নিবন্ধের সার নির্যাস। লোকেরা দারুণ পছন্দ করল আমার বক্তব্য। ঐ মাঠের মুসল্লীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল আধুনিক শিক্ষিত। বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীও ছিল অনেকেই। বড় চাচা বাড়ি ফিরে এসে আমার

www.pathagar.com

আব্বা আম্মাসহ অনেককেই শুনালেন আমার বক্তৃতার কথা। বড় চাচার মুখে এ ঘটনা শুনে আব্বা-আম্মাসহ আমাদের খান পরিবারের সবাই খুব খুশি হলেন। বড় চাচার মুখে নিজের আনাড়ী বক্তৃতার প্রশংসা শুনে মনে মনে খুবই লজ্জিত হচ্ছিলাম। কারণ বক্তৃতা যদি কিছুটাও ভাল হয়ে থাকে তাহলে তাতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। কৃতিত্ব সবটাই মাওলানা মওদূদী (র.) এর ঐ নিবন্ধের যা আমি খুঁজে পেয়েছিলাম, পুরনো পত্রিকা 'হামদর্দের রমযান সংখ্যায়'। পরবর্তীতে সেটা দেখেছি নামাজ রোজার হাকিকত বইয়ের মধ্যে।

শিবপুর মাদরাসা পাবনা শহর থেকে ১০ মাইল দূরে হওয়ার কারণে আমাদের বন্ধু বান্ধবদের অনেকেই শহরে যাওয়া আসা করতেন। পুষ্পপাড়া মাদরাসা পাবনা সদর থানায় এবং শহরের মাত্র ৮ মাইল দূরত্বে হওয়ার কারণে তাদের সম্পর্ক পাবনা শহরের সাথে ছিল আরো বেশী। পাবনায় কোন ইসলামী ইস্যুতে জনসভা বা সমাবেশ হলে এই দুই মাদরাসার ছাত্র শিক্ষকগণ প্রায়ই উপস্থিত হতেন দেশের রাজনীতির হাল হাকিকত জানার জন্যে। আমরা দুই মাইল কাঁচা রাস্তা হেঁটে গিয়ে এরপর রিকশা টমটম (ঘোড়াগাড়ী) বা বাসে চড়ে পাবনা যেতাম সভা শুনতে। অনেক সময় রাত বেশী হয়ে গেলে মসজিদে রাত কাটাতেও হয়েছে।

ইতোমধ্যেই যুক্তফ্রন্টের শরীকদল নেজামে ইসলাম প্রাদেশিক মন্ত্রীসভায় কোয়ালিশন সরকারে যোগদান করেছে। প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছেন আশরাফুদ্দীন চৌধুরী। তিনি পাবনা এসেছেন জনসভা করতে। আমরা আমাদের মাদরাসা থেকে উক্ত জনসভায় উপস্থিত হয়ে দেখলাম, পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের ছাত্র নেতারা জনসভায় কিছু সমস্যা সৃষ্টি করছে। আমাদের পরিচিত এবং আত্মীয় আব্দুল মতিন ভাইকে (লাল মিয়া) দেখলাম ছাত্রদের কিছু দাবি দাওয়া নিয়ে সভায় আগত অতিথি আশরাফুদ্দীন চৌধুরীর সাথে বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হয়েছেন। চৌধুরী সাহেব অবশ্য যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় দিলেন। উক্ত সভায় আমাদের পার্শ্ববর্তী থানা শাহজাদপুরের মাওলানা সাইফুদ্দিন ইয়াহিয়া সাহেবও ছিলেন। সভায় সকলের মন জয় করার মত বক্তব্য রাখেন প্রফেসর আব্দুল সোলতান সাহেব। সেদিন লক্ষ্য করলাম, জনগণের একটি অংশ ছাত্রদের আচরণে

www.pathagar.com

বেশ ক্ষুব্ধ, তারা ঘোষণা করলেন এরপর থেকে কলেজের এই আচরণকারী ছাত্রদের আর লজিং রাখা হবে না। অল্প ব্যবধানে একটি জনসভার খবর জানলাম আমাদের মাদরাসার আশেপাশে পোস্টার লাগানো দেখে। তাছাড়া একদণ্ড হাটের দিনেও পাবনা শহরের সভা সমাবেশের প্রচার হত। ঐ জনসভাটি ছিল আওয়ামী লীগের। মাওলানা ভাসানী শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়াও সীমান্ত গান্ধী নামে পরিচিত খান আব্দুল গাফফার খান এবং হিশা-মুদ্দীন নামের দুজন তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারাও এসেছিলেন। জনসভার স্থান ছিল পাবনা আলিয়া মাদরাসা মাঠ। মাঠটি মেইন রোডের সাথে। পাবনা এডওয়ার্ড কলেজও এই মাদরাসার পাশেই অবস্থিত। '৫৪তে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে জোরালো সমর্থন থাকার কারণে ঐ সময় পর্যন্ত মাওলানা ভাসানী এবং শেখ মুজিবুর রহমান এই প্রবীণ ও নবীন দুই নেতার প্রতিও মনে বেশ আবেগ অনুভব করতাম।

কিন্তু ঐ সমাবেশে মাওলানা ভাসানীর বক্তৃতায় আলেমদের প্রতি কটাক্ষমূলক বক্তব্য থাকায় পূর্ব থেকে লালন করা ধারণা ও আবেগের অবসান ঘটল এখানেই। সীমান্ত গান্ধী নামে পরিচিত খান আব্দুল গাফফার খানের বক্তৃতা শোনার জন্যে বেশ রাত হয়ে যায়। যতদূর মনে পড়ে আমরা কয়েকজন মসজিদের বারান্দায় রাত্রি যাপন করি। ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে ইতিহাস লেখাকে আমি বেশ কঠিন মনে করি। এক জনসভা ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চে পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণার আগে ছিল না পরে এটা আমার মনে নেই। আমাদের মাদরাসায় ১৯৫৬ সনের ২৩ মার্চ মাসের সংখ্যাটি ছিল বেশ তথ্য সমৃদ্ধ। তাতে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত বেশ মূল্যবান অনেকগুলো নিবন্ধই স্থান পেয়েছিল। মাহে নও পত্রিকাটি সরকারিভাবে প্রকাশিত একটি উন্নতমানের মাসিক পত্রিকা ছিল। এর সম্পাদক ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও কবি আব্দুল কাদির সাহেব। আমাদের বাড়িতেও খান ব্রাদার্স লাইব্রেরীতে এটি নিয়মিত আসত। আর শিবপুর মাদরাসায় আমার বন্ধুর সাথে মিলে দুজনের টাকায় আমার নামেও একটি পত্রিকা আনার ব্যবস্থা করি। আমার বন্ধু এটা পড়ার ব্যাপারে তেমন আগ্রহী ছিলেন না। আমাকে সাহায্য করার জন্যে এতে শরীক হন। শিবপুর মাদরাসার বেশ কিছু সাহিত্য পাঠক প্রতিভাবান ছাত্রের

www.pathagar.com

সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠে। তাদের কেউ কেউ দৈনিক আজাদের মুকুলের মাহফিলের সদস্য। তাদের দেখাদেখি আমিও অনেকগুলো পত্রিকার কিশোরদের আসরে লেখালেখি শুরু করেছিলাম। ফলে পাঠ্য বইপুস্তকের বাইরে উপন্যাস গল্প ও কবিতার বই পড়ার প্রতি ভীষণ ঝোঁক সৃষ্টি হয় আমার মধ্যে। ফলে আলেম ১ম বর্ষের বার্ষিক পরীক্ষায় ১ম স্থানে উত্তীর্ণ হলেও দ্বিতীয় বর্ষে গিয়ে এই ভাল ফলের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হল না। আমি এবারের পরীক্ষায় তৃতীয় হলাম। বাড়িতে মুরুব্বীদের তিরস্কার বকুনীর কারণে সাহিত্য চর্চার উন্মাদনা থেকে অনেকটা জেদের বশবর্তী হয়েই নিজেকে মুক্ত করলাম। আমার কাঁচা হাতে লেখা গল্প কবিতা যা ছিল সব মাদরাসার পাশের নদীতে কচুরী পানার মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে আমার পাঠ্য বইয়ের দিকে মনোযোগী হলাম।

প্রথম দিকে কেন যেন কবিতার দিকে ঝুঁকে পড়ি। আজাদ পত্রিকায় মুকুলের মাহফিলে একটি ছোট কবিতা ছাপা হবার পর কবিতার নেশা বেশ বেড়ে যায়। কিন্তু এ অভ্যাস স্থায়িত্ব পায়নি। এরপর গল্পের বই পড়া এবং লেখার দিকে কিছু দিনের জন্যে ঝুঁকে পড়ি। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে চিন্তামূলক প্রবন্ধ পড়তে ভাল লাগা শুরু হয়।

মাদরাসার শিক্ষার মাধ্যমে উর্দু থাকার কারণে ভাল উর্দু শেখার উদ্দেশ্যে একটা উর্দু সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়মিত পড়ার চিন্তা করলাম। পাবনা শহরে হাঁটতে হাঁটতে একটা দোকানে একজন অবাঙ্গালীর হাতে 'এশিয়া' নামক একটি সাপ্তাহিক উর্দু পত্রিকার ঠিকানা যোগাড় করে প্রথমে ছ'মাসের গ্রাহক হয়ে মানি অর্ডার যোগে টাকা পাঠালাম। পত্রিকাটি বেশ নিয়মিত আসতে থাকে আমার নামে। এতে বেশ মূল্যবান প্রবন্ধ দেখে আমার অনুবাদের ইচ্ছা জাগে। এ থেকে আমার অনুবাদকৃত একটি প্রবন্ধ মাদরাসার ম্যাগাজিনে ছাপা হয়। অবশ্য তা ছাপা হয় আমি উক্ত মাদরাসা থেকে বিদায় নিয়ে ঢাকা আলীয়ায় ভর্তি হবার পর।

১৯৫৭ সনে আমি আলিম তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষায় ১ম বর্ষের মত ভালফলের ধারাবাহিকতা রক্ষা না পাওয়ায় মনে ব্যথা ছিল, সেই সাথে কিছুটা জেদও ছিল। আমাদের পাঠ্যসূচিতে উর্দু সাহিত্যের বইতে একটি বেনামী প্রবন্ধ ছিল যার শিরোনাম ছিল 'ইসলামকা মোয়াশেরাতী

www.pathagar.com

নেজাম'- ইসলামের সামাজিক ব্যবস্থা। লেখাটির বিষয়বস্তু ইসলামের একটি সুন্দর উপস্থাপনা সেই সাথে সাহিত্যিক মান বেশ উন্নত অথচ খুবই সহজ বোধ্য। লেখকের পরিচয় না জেনেও প্রবন্ধটি আমার খুব পছন্দের ছিল এবং প্রায় মুখস্ত হয়েছিল। ইতোমধ্যে পাবনার একটি জনসভার পোস্টার এল আমাদের মাদরাসায়। জনসভা পাবনা জেলা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে আয়োজিত প্রধান অতিথির নাম লেখাছিল ফাঁসির মঞ্চ বিজয়ী বীর আল্লামা আবুল আ'লা মওদূদী।

১৯৫৫ সন থেকে যাকে জানার সাধ্যমত চেষ্টা করে আসছি। এবার তাকে দেখার এবং তার কথা শোনার সুযোগ কি আর ছাড়া যায়? আমাদের মাদরাসার অনেক শিক্ষকও ঐ জনসভায় যোগদান করেন। আমার সিনিয়র জুনিয়র অনেক ছাত্ররাই আগ্রহ করে ঐ জনসভায় যোগদান করেন। আমি জনসভার প্রথম কাতারে স্থান নেয়ার চেষ্টা করি। জনসভা শুরুর নির্দিষ্ট সময়ে পাবনা জেলা জামায়াতের সে সময়ের আমীর মাওলানা আব্দুস সোবহান সাহেব, মাওলানা মওদূদীকে রিকশা যোগে টাউন হলের ময়দানে নিয়ে এলেন। এত বড় নেতাকে মাওলানা আব্দুস সোবহান সাহেব পাশে বসে রিকশায় করে এভাবে কেন আনলেন, মনে মনে আমি একটু ক্ষোভই অনুভব করলাম। আসরের নামাজ হল। ভাগ্যক্রমে মাওলানার ডান পাশে বলতে গেলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আসরের নামাজ আদায় করলাম। মাওলানার জ্যোতির্ময় স্বর্গীয় চেহারা দেখে আমি যার পর নাই মুগ্ধ হই। মাওলানার যে লেখা প্রথম পড়ার সুযোগ পাই 'রোজা ও আত্মসংযম (রোজা আওর জবতে নফস)' তা থেকেও মাওলানাকে একজন রূহানী নেতা মনে হয়েছিল। চেহারা দেখেও মনে হল ইনী একজন সত্যিকারের মর্দে মুমিন, মর্দে মুজাহিদ এবং রূহানী জগতের সাধক পথ-প্রদর্শক। আমরা ফুরফুরা এবং জৈনপুরীর সিলসিলার পীর বুজর্গদের নুরানী চেহারা দেখে অভ্যস্ত ছিলাম বিধায় মাওলানাকে তাদের চেয়ে রূহানী জগতে অনেক বেশী অগ্রসর একজন কামেল ইনসান মনে হয়েছে। এটা ছিল আমার সেই কিশোর বয়সের কচি মনের একটি তাৎক্ষণিক অনুভূতি।

মাওলানার বক্তব্যের মূল বিষয় সেই সময়ের যুক্ত নির্বাচন ও পৃথক নির্বাচনের ইস্যু হলেও, মাওলানা তার বক্তব্যে জামায়াতে ইসলামীর খুব

www.pathagar.com

সংক্ষিপ্ত একটা পরিচিতিমূলক বক্তব্য দিলেন, যাতে মূলত ইসলামের প্রকৃত পরিচয়ই তুলে ধরা হয় একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে। মাওলানার বক্তব্যের ভাষা এবং আমাদের উর্দু পাঠ্য পুস্তকের প্রবন্ধের (ইসলাম কা মোয়েশেরাতী নেজাম) ভাষা হুবহু একরমক মনে হয়েছে। আমি পরবর্তীতে মাওলানার ভাষা অনুকরণের চেষ্টাও করেছি। অবশ্যই পরে দেখেছি, মাওলানার 'ইসলামের জীবন পদ্ধতি' 'ইসলাম কা নেজামে হায়েতি' বইয়ের অংশ বিশেষ (ইসলাম কা মোয়েশেরাতী নেজাম) আমাদের পাঠ্যপুস্তক 'নওরোজ' উর্দু বইয়ের সংকলিত হয়েছিল।

মাওলানা গতানুগতিক রাজনৈতিক নেতাদের মত চিৎকার করে, হুংকার ছেড়ে, হাত পা নেড়ে বক্তৃতা করেননি। খুবই ঠাণ্ডাভাবে ধীরে ধীরে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার মাঝে কিছুক্ষণ পর পর বাংলায় অনুবাদ করেন মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেব। মাওলানা মওদূদীর ভাষা ছিল যেমন উন্নতমানের তেমনি মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেবের অনুবাদের ভাষাও ছিল বেশ উন্নত সাহিত্যিক মানে সমৃদ্ধ।

মাওলানার বক্তৃতার মাঝখানেই মাগরিবের নামাজের আয়োজন করা হয়। ইমামতি করেন মাওলানা মওদূদী নিজেই। আমি এদিক দিয়ে নিজেকে বেশ ভাগ্যবান মনে করি। আসরের নামাজ আদায় করেছি মাওলানার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। আর মাগরিব আদায় করেছি তার ইমামতি একেবারে তার পিছনে দাঁড়িয়ে।

মাওলানার বক্তৃতা এবং লেখায় যে রূহানীয়াতের ছাপ পরিলক্ষিত হয়েছিল আমার কাছে, নামাজে মাওলানা ধীরে ধীরে থেমে থেমে কুরআন তেলাওয়াত করায় তা আরো গভীরভাবে অনুভূত হয় আমার কিশোর মনে।

সভাস্থলের মধ্যে থেকে অনেকেই মাওলানার সুদর্শন চেহারায় মুগ্ধ হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে থাকেন। এর মধ্যে আমার বোয়ালমারী মাদরাসার ক্বারী হাবিবুর রহমান সাহেব হুজুরের মন্তব্যের ভাষা এখনও আমার কানে বাজে। তিনি মাওলানাকে দেখে আবেগ আপ্লুত হয়ে মন্তব্য করেন, একজন খাঁটি মুজাহিদ বটে। সেই

www.pathagar.com

মাদরাসায় আমার একজন প্রিয় শিক্ষক হেড মাওলানা নাজির আহমদ হুজুরের মন্তব্য ছিল অনেকটা এরকমই।

ইতঃপূর্বে ঐ ময়দানে মুসলিম লীগ আয়োজিত এক জনসভায় যুক্তফ্রন্টের ব্যর্থতার সমালোচনাসহ নেতৃবৃন্দের বক্তৃতায়, বিশেষ করে শাহ আজিজুর রহমান সাহেবের বক্তৃতা শুনে মুসলিম লীগের রাজনীতি করার চিন্তা শুরু করেছিলাম। কিন্তু আজকের এই দিনে মাওলানা মওদূদীকে সচক্ষে একান্ত কাছে থেকে দেখে তার বক্তব্য শুনে, নামাজে তার কোরআন তেলাওয়াত শুনে সব চিন্তা মন মগজ থেকে ঝেড়ে মুছে ইসলামী আন্দোলনের সাথে নিজেকে একাত্ম করে ফেলি। নিঃসন্দেহে আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় এবং অর্থবহ দিন এই জনসভার দিনটি। আমার বর্তমান অবস্থান আসার ক্ষেত্রে এটাই ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

মনের মধ্যে দারুণ বিপ্লবী পরিবর্তন অনুভব করলেও বাস্তবে এর রূপ দেয়ার সুযোগ হয়নি। কারণ তখন জামায়াতের সংগঠন ছিল একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে। ছাত্র সংগঠনের নামটিও তখন পর্যন্ত শোনার সুযোগ হয়নি। অতএব ঐ একদিনের অনুভূতি বাস্তবে রূপ দেবার কোন সুয়োগই ছিল না আমার হাতের নাগালে। আমি যখন আলিম তৃতীয় বর্ষের ছাত্র তখনই সদ্য কামেল পাস করে আমাদের শিক্ষক হয়ে আসলেন মাওলানা ইসহাক সাহেব। তার বাড়ী মাদরাসা থেকে নদীর দক্ষিণ পাড়ের সোনাপুর গ্রাম পেরিয়ে পাবনা রোডের পাশের গ্রাম মধুপুরে। তিনি ছাত্র নেতা হিসাবে মাদরাসা ছাত্রদের কাছে বেশ পরিচিত ছিলেন। ৫/৬ বছরের জুনিয়রদের সাথেও তার ছিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক। তার বাড়ির পাশ দিয়েই আমাকে আসতে হতো গ্রামের বাড়ি থেকে ছুটি কাটিয়ে মাদরাসায় আসার পথে। তিনি আমাদের শিক্ষক হিসাবে আসার পর কয়েক দফা নেজামে ইসলাম পার্টির নেতৃবৃন্দ আমাদের মাদরাসা এসেছেন। হুজুর তাদের সাথে আমাকে বিশেষভাবে পরিচয় করিয়ে দিতেন। হুজুর চাইতেন আমি যেন ভবিষ্যতে নেজামে ইসলামের সাথে জড়িত হই।

একদিন আমি হুজুরকে জিজ্ঞেস করলাম ইসলামের নামে ২টি দলের কী দরকার? অর্থাৎ নেজামে ইসলাম ও জামায়াতে ইসলামী মিলে একটি দল হলে ভাল হয় না? হুজুর বলেন না বাবা তা সম্ভব নয়। নেজামে ইসলাম

www.pathagar.com

একটি উদার পার্টি এবং আলেম ওলামা প্রধান পার্টি। জামায়াতে ইসলামীতে সাংগঠনিক নিয়ম-শৃঙ্খলার কড়াকড়ি সাংঘাতিক। অনেকটা কমিউনিস্ট পার্টির মত। তাছাড়া মাওলানা মওদূদীর চিন্তা ধারার ব্যাপারে আলেমদের অনেকের মনে প্রশ্ন আছে। আমি এ নিয়ে আর হুজুরের সাথে কোন আলোচনায় অগ্রসর হইনি।

১৯৫৮ সালের ১৪ আগস্ট উপলক্ষে আমাদের মাদরাসায় বহুমুখী অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি ছিল রচনা প্রতিযোগিতা। বিষয় ছিল 'ইসলাম ও রাজনীতি'। আমি উক্ত রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিই। এজন্যে সহায়ক বই পুস্তক তালাশ করতে থাকি। মাহে নওয়ের বিশেষ সংখ্যায় (১৯৫৬ এর মার্চ সংখ্যা) কিছু মূল্যবান প্রবন্ধের কথা আমার আগেই জানা ছিল। এরপরও মাওলানা ইসাহাক সাহেব হুজরের কাছে রেফারেন্স বই হিসাবে কিছু বইয়ের সন্ধান জানতে চাইলে তিনি বললেন এর উপরে বাবা একমাত্র মাওলানা মওদূদীর লেখা বইয়ের সাহায্য নিতে পার। এ জন্যে তুমি পাবনা জেলা জামায়াতের অফিসে যোগাযোগ করতে পার। আমি সাথে সাথেই পাবনা শহরে চলে গেলাম। সোজা জামায়াতের জেলা অফিসে গিয়ে বই খুঁজতে থাকলাম। ইসলামের উপরে এই সুন্দর বই পুস্তক, আধুনিক যুগসন্ধিক্ষণে ইসলামের সুন্দর উপস্থাপনার বিষয়টি আমার কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজানা। আমি বই পুস্তকগুলো নাড়াচাড়া করে অবাক হলাম। মনে হল সবগুলো বই এক কপি করে কিনে নেই। তবে পকেটে অত পয়সা ছিল না। শিবপুর থেকে সকালে রওয়ানা করে পাবনায় গিয়ে মাঝে কিছু খাওয়া দাওয়ার করার কথা কিন্তু তা ভুলে গেছি। ফেরার গাড়ী ভাড়ার কথাও আমলে নেইনি, পকেটে যা ছিল সব উজাড় করে কয়েকটা বই কিনে পাবনা শহর থেকে শিবপুরে দশ মাইল পথ পায়ে হেঁটেই এসেছি। রচনা লেখার চেয়ে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় জানার আগ্রহটাই প্রাধান্য পায় এই সময়ে আমার মনে। আল্লাহ এভাবেই আমাকে দৃঢ়ভাবে দাঁড় করিয়ে দেন ছিরাতুল মুস্তাকিমে।

আমি পাবনার জামায়াত অফিস থেকে মাওলানা মওদূদী লিখিত বইয়ের বাংলায় অনূদিত বেশ ক'টি বই কিনে নিলাম। আগেই বলেছি পকেটে বেশী টাকা থাকলে সবগুলোই এক কপি করে কিনে নিতাম। সেদিন যে ক'টি

www.pathagar.com

কিনেছিলাম তা ছিল, ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ (উর্দুতে ইসলাম কা নজরিয়ে সিয়াসী)- ইসলামের জীবন পদ্ধতি (ইসলাম কা নেজামে হায়াত) ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ, একমাত্র ধর্ম, (দ্বীন হক) এবং ঈমানের হাকিকত, ইসলামের হাকিকত ও নামাজ রোজার হাকিকত। ইসলামের জীবন পদ্ধতি ও রাজনৈতিক মতবাদ বই দুটি থেকে সাধ্যমত সাহায্য নিয়ে আমি "ইসলাম ও রাজনীতি" বিষয়ে আমার রচনাটি দাঁড় করালাম। সাথে মাহে নওয়ারে ইসলামী প্রজাতন্ত্র উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যার প্রবন্ধগুলো থেকেও কিছু সাহায্য নিলাম। তবে ইসলামের জীবন পদ্ধতি বইটির ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় যে সারবস্তু পেলাম তার সাথে আর কোন লেখারই তুলনা চলে না। আমি ইসলামের জীবন পদ্ধতি বইয়ের একটি অধ্যায়ে 'ইসলামের সামাজিক ব্যবস্থা' পড়তে গিয়ে অবাক হলাম, এটাই উর্দু সাহিত্যের পাঠ্যসূচির সেই প্রবন্ধটি যেটার ভাষার সাথে মাওলানা মওদূদীর ভাষার মিল খুঁজে পেয়েছিলাম। অতএব যে প্রবন্ধের লেখকের নাম জানা ছিল না এবার রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের মহিমায় সেই নামটি জানা হয়ে গেল।

আমি অল্প সময়ে অধিক পরিমাণে মাল মাশলা পেয়ে যাওয়ার ফলে আমার রচনাটি যথেষ্ট তথ্যসমৃদ্ধ হলেও খুব একটি সুলিখিত রচনা হয়েছে বলে নিজের কাছেও মনে হয়নি। রচনা লেখার জন্যে তখন জানার বিষয়টি আমার কাছে হয়ে দাঁড়ায় মুখ্য। রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল না জানিয়েই তিনজকে রচনা পড়তে বলা হয়। আমার নামটি প্রথম ডাকাতে অনেকেই মনে করেছিলেন প্রথম পুরস্কারটি বোধ হয় আমিই পাব। কিন্তু না আমার একক্লাশের নিচের (অর্থাৎ আলিম তৃতীয় বর্ষের) একজনকে ১ম ঘোষণা করা হল, আমাকে ঘোষণা করা হল দ্বিতীয় হিসাবে আর আমার এক বছরের সিনিয়র একজনকে ঘোষণা করা হল তৃতীয় হিসাবে। আমার এতে দুঃখ বোধ এজন্যেই ছিল না যে আমার পুরস্কার লাভের চেয়েও ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে, ইসলামের রাজনীতি আছে কি নাই থাকলে তার গুরুত্ব কতটুকু এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সুযোগ পাওয়াই ছিল বড় প্রাপ্তি। আমি জেনেছি বিচারক মন্ডলীর তিনজনের দু'জন একজন হেড মাওলানা এবং একজন হেড মাস্টার (ইংরেজী শিক্ষক) আমাকে প্রথম ঘোষণার পক্ষে ছিলেন, কিন্তু সুপার সাহেব ভেটো প্রয়োগ করে অপর জনকে প্রথম ঘোষণা

www.pathagar.com

করেন। দুইজনই আমাকে পরবর্তী পর্যায়ে ব্যক্তিগত আলোচনায় এ বিষয়টি অবহিত করেন। হেড মাওলানা হুজুর অবাক বিস্ময়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন এত কিছু তথ্য তুমি কোত্থেকে কিভাবে যোগাড় করলে? হুজুর অবশ্য জানতো আমি ক্লাশের পড়াশুনার বাইরে পত্র-পত্রিকা এবং বিভিন্ন বই পুস্তক পড়াশুনা করে থাকি। হুজুরকে আমি পরে মাওলানার মৌলিক উর্দু বই পড়তে দিয়েছি। মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত উচ্চসিত প্রশংসা করেছেন। মাওলানা মওদূদী সর্ম্পকে তিনি বেশ উঁচু ধারণাও পোষণ করতেন।

এই রচনা লেখার সুবাদে ইসলামী আন্দোলনের মৌলিক চিন্তার ভিত রচিত হয় আমার মনের মাঝে। তখনও জানা ছিল না ছাত্রদের জন্যে ইসলামী আন্দোলনের কোন সংগঠন আছে। সরাসরি জামায়াতের সাথে মিলে কাজ কিভাবে করা যায় চিন্তা করছি। আর যত বেশী বেশী বই যোগাড় করা যায়, যোগাড় করে পড়াশোনায় চেষ্টা করছি। ইতোমধ্যে '৫৮ এর অক্টোবর মাসে সারা পাকিস্তান সামরিক আইন জারির সুবাদে রাজনৈতিক দলের তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে মনের চাহিদা অনুযায়ী জামায়াতে ইসলামীর সাথে মিলে কাজ করার আশা অপূর্ণ রয়ে গেল।

১৯৫৮ সন ছিল আমার আলেম শেষ বর্ষ। ১৯৫৯ এর এপ্রিল -মে'র দিকে পরীক্ষা হবার কথা। আলেম শেষ বর্ষের ষান্মাসিক পরীক্ষাটা বিশেষ কিছু কারণে খুব একটা ভাল হয়নি। টেস্ট পরীক্ষায় একটু খামখেয়ালী বশতঃ ফেকাহর সাথে উসুলে ফেকাহ পরীক্ষা দেওয়া থেকে অনুপস্থিত থেকে যাই। ফেকাহ উসুলে ফিকাহ নিয়ে গ্রুপ হওয়ার কারণে পাশ করতে অসুবিধা হয়নি এবং ফল প্রকাশের দিন আমাকে ১ম স্থানেই ঘোষণা হয়েছে। রমজানের অল্প পরেই ফাইনাল পরীক্ষা। আল্লাহর রহমতে প্রস্তুতি পর্ব সেরে পরীক্ষা দিলাম।

আমাদের কেন্দ্র ছিল সিরাজগঞ্জ আলীয়া মাদরাসা। দাখিল পরীক্ষার সময় বয়স কম থাকায় ও একটু চঞ্চল ও অস্থির প্রকৃতি থাকায় ফলটা আশানুরুপ না হওয়ায় মনে অনুতাপ-অনুশোচনা ছিল। এবারেও ইসলামের ইতিহাস এবং ফারায়েজের পরীক্ষায় কেন যেন নিজেই সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। যাহোক পরীক্ষা শেষ করে বাড়ি গিয়ে একটু ইংরেজী শেখার জন্য চেষ্টা

www.pathagar.com

করতে থাকলাম। পরীক্ষার মাস তিনেক পরেই রেজাল্ট হবার কথা। সঠিক দিন তারিখ না জেনেই অনুমানের ভিত্তিতে কাছাকাছি সময়ে শিবপুর গিয়েছি। একটু খোঁজ খবর নেওয়ার জন্যে একদিন ভোরে আমার সহপাঠি ওসমান গণিকে সাথে নিয়ে পাবনা শহরে বেড়াতে যাই। কৌতুহল বশতঃ পাবনা জামায়াতের অফিসে মাওলানা সুবহান সাহেবকে বসা দেখে আমরা দু'জনই তার সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনিও শিবপুর মাদরাসার ছাত্র ছিলেন। তার কাছে একটা দৈনিক পত্রিকায় দেখলাম মাদরাসার আলেম, ফাজেল ও কামেলের রেজাল্ট বের হয়েছে। তবে পূর্ণ রেজাল্ট নয় শুধু মেধা তালিকা ছাপা হয়েছে। আলেমের ২০ জনের মেধা তালিকায় আমার নামটি ১৭ নম্বরে দেখতে পেলাম- আলহামদুলিল্লাহ।

এরপর একটা পত্রিকা কিনে আমরা দুই বন্ধু তাড়াতাড়ি পাবনা থেকে মাদরাসায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। মাদরাসায় তখনও ক্লাশ চলছে। খবরটি দেওয়ায় ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে বেশ আনন্দ উৎসবের সৃষ্টি হয়। সপ্তদশতম স্থান খুব একটা উল্লেখ করার মত না হলেও দাখেলের ৬১ থেকে ১৭তম উন্নীত হওয়ায় ব্যক্তিগতভাবে আমি আল্লাহর শুকরিয়া জানালাম।

ঐদিনটা মাদরাসার ছাত্র শিক্ষকদের সাথে এবং শিবপুর ও পাশ্ববর্তী গ্রামের লোকজনের সাথে বেশ হাসি খুশিভাবে কাটিয়ে পরের দিন বাড়ীর পথে রওয়ানা করলাম। আমার গ্রামের বাড়ি পৌঁছার আগেই সাঁথিয়াতে মাদরাসা এবং হাইস্কুলের ছাত্র শিক্ষকদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করলাম। নানা বাড়ীতে গিয়ে খবরটা পৌঁছিয়েই বাড়ীতে আব্বা আম্মা ও পরিবারের অন্যান্য মুরুব্বীদের খবরটা জানানোর জন্যে দ্রুতই বাড়ি পৌঁছার চেষ্টা করলাম। সবাইকে এ খবরে বেশ হাসি খুশি দেখে আমারও বেশ আনন্দই লাগল। এরপর ফাজেল পড়ব কোথায়, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে আমি একটু ভুল করেই বসলাম। কেন যেন সিরাজগঞ্জ মাদরাসায় ভর্তি হবার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু দেড় দু'মাসের বেশী থাকতে পারলাম না। শিবপুরের মত অন্তরঙ্গ পরিবেশ সিরাজগঞ্জে যেন মোটেই পেলাম না। শিবপুরে শিক্ষকদের স্নেহ, ছাত্রদের আন্তরিক ভালোবাসা ও এলাকার সাধারণ মানুষের আন্তরিকতা আমার পক্ষে মোটেই ভোলা সম্ভব হল না। আমি এক পর্যায়ে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মাওলানা ইয়াকুব সাহেবকে (যিনি সাধারণত

www.pathagar.com

কোলার হুজুর নামে পরিচিত ছিলেন) মনের আবেগ প্রকাশ করে শিবপুরে ফিরে যাওয়ার কথা জানিয়ে চিঠি লিখলাম এবং উনার সহযোগিতা চাইলাম। কারণ সিরাজগঞ্জ থেকে টিসি নেওয়ার ব্যাপারে এবং স্কলারশীপের টাকা তোলার ব্যাপারে যাতে কোন সমস্যা না হয় সেজন্যে উনার মত অভিজ্ঞ ও প্রভাবশালী শিক্ষকের সহযোগিতা প্রয়োজন। হুজুর অত্যন্ত দরদ দিয়ে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে আমাকে ফিরে যাবার অনুমতি দিলেন। ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত না নেয়ার খেসারত দিয়ে সিরাজগঞ্জ থেকে বিদায় নিয়ে শিবপুর পৌঁছলাম প্রবল বৃষ্টির মধ্যে-ট্রেন যোগে ঈশ্বরদী পাবনা হয়ে। শিবপুরে সরাসরি পৌঁছার আগে একরাত অবস্থান করলাম মাওলানা ইসহাক সাহেব হুজুরের মধুপুরের বাড়িতে।

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসায় সবাইকে বেশ খুশি মনে হলেও আমার টিসি হাতে না পাওয়া পর্যন্ত এবং স্কলারশীপের টাকা তোলার নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্যন্ত মনটা আমার কিছুটা হলেও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে। মাওলনাা ইয়াকুব সাহেব হুজুর নিজে সিরাজগঞ্জ গিয়ে আমার টিসি নিয়ে এলেন এবং স্কলারশীপের টাকা তোলার ব্যাপারটিও নিশ্চিত করে এলেন। তার এই স্নেহভরা সহযোগিতার কথা কোন দিন ভুলবার নয়। আল্লাহ তাকে সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমি আবার ফিরে এলাম আমার নিজের ভুবনে।

আসলে সাঁথিয়ার পর শিবপুর আমার কেন যেন সবচেয় ভাল লাগত। ঢাকা আলীয়ায় কামিল পড়ার সময় ছুটিতে বাড়ি গেলে আমি অন্তত কয়েকদিনের জন্যে হলেও শিবপুরে না গিয়ে পারতাম না। শুধু মাদরাসার ছাত্র শিক্ষকই নয় এলাকার লোকজন কেন যেন আমাকে একটু অন্য দৃষ্টিতে দেখত। এ মাদরাসার অল্প সংখ্যক স্থানীয় ছাত্র ছাড়া সবাই স্থানীয় লোকদের বাড়িতে লজিং থাকত। ছাত্রদের লজিং যোগাড় করে দেয়ার দায়িত্ব মাদরাসা কমিটির সদস্যগণ এবং শিক্ষকগণই পালন করতেন। তবে ছাত্ররাও কোন কোন ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখত। আমি এদিক দিয়ে একটু বেশী ভাগ্যবান ছিলাম; মাদরাসার কমিটির মেম্বার এবং শিক্ষকের কথায় লজিং রাখতে রাজি হয়নি, এমন ব্যক্তিও আমার কথায় লজিং রাখতে রাজি হওয়ার ঘটনা ঘটেছে অনেকবারই।

www.pathagar.com

সেই শিবপুর ছেড়ে সিরাজগঞ্জে শহুরে পরিবেশে খাপ খাওয়ানো আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হচ্ছিল না। তাই মাত্র দেড় দু'মাসের মধ্যেই ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হই এবং ফিরে এসে মনের শান্তি ও স্বস্তি ফিরে পাই। তবে ফাজিল ১ম বর্ষের পড়াশোনা আমার দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যা কাটিয়ে ওঠা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি বিধায় ফাজিল ফাইনাল পরীক্ষায় শুধু ১ম বিভাগ পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

আমার আলিম পরীক্ষার আগেই মাদরাসা থেকে একটা ম্যাগাজিন বের করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। গ্রামের মাদরাসা থেকে একটা ম্যাগাজিন বের করার বিষয়টি খুব একটা সহজ ব্যাপার ছিল না। অনেক চেষ্টা করেই ছাত্র প্রতিনিধি ও শিক্ষকদেরকে এ ব্যাপারে রাজি করাতে সক্ষম হই। প্রথমে আমরা একটা হাতে লেখা ম্যাগাজিন বের করি। এর একটা কপি জনাব মাওলানা ইসহাক সাহেব দেখেছিলেন, আমাদের মাদরাসার শিক্ষক হয়ে আসার আগেই। তিনি হাতে লেখা ম্যাগাজিনটা দেখে প্রশংসা করেছিলেন। তাকে শিক্ষক হিসাবে পেয়ে আমরাও উৎসাহ বোধ করলাম। লেখা জমা করা ও সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও ম্যাগাজিনটা প্রকাশ হতে পারেনি।

আমি শিবপুরে ফিরে এসে আবার ঐ ম্যাগাজিনটা প্রকাশের উদ্যোগ নিলাম। কিন্তু এসব কাজে পদে পদে বাধা এসে দাঁড়ায়। আমি ফাজিল পরীক্ষা শেষে ঢাকা আলিয়ায় ভর্তি হবার পরে ম্যাগাজিনটি প্রকাশ পায়। এতে আমার একটা কবিতা, রাসূল (সা.) এর রিসালাতের ব্যাপকত্বের উপরে লেখা একটি প্রবন্ধ, একটি আরবী ও ইংরেজী প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছিল। সম্ভবত ঐ মাদরাসায় ইতঃপূর্বে কোন দিন কোন ম্যাগাজিন ছাপা হয়নি। পরেও আর হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে এ ধরনের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব আমার জন্যে ছিল খুবই পীড়াদায়ক। আমার মাদরাসার শিক্ষা জীবনের সাধনার কেন্দ্র বিন্দু ছিল এই হীনমন্যতাবোধ ও নেতিবাচক মন-মানসিকতায় পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা। ঢাকা আলিয়ায় ভর্তি হবার পর এতে বেশ কিছুটা সাফল্যের পথ প্রশস্ত হয় সারা দেশের নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের সাথে যোগাযোগের সুযোগ পাওয়ার সুবাদে।

www.pathagar.com

১৯৫৯ সনের শেষার্ধ সিরাজগঞ্জ এবং শিবপুরের মাঝে দৌড়াদৌড়িতেই কেটে যায়। ফাজিল ১ম বর্ষের পুরা সময়টাই এর মধ্যে ছিল। তাই এ বছরের তেমন উল্লেখযোগ্য অন্য কোন বিষয় নেই। এ বছরে সিরাজগঞ্জ থেকে আসার পর আমাকে কিছুদিন মাদরাসা বোর্ডিংয়ে থাকতে হয়। বোর্ডিং বলতে মাদরাসার একজন কমিটি সদস্যের বাড়িতে খাবারের ব্যবস্থা হত। ছাত্ররা থাকত কষ্ট করে মাদরাসার ক্লাসরুমেই। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে আমি একটা উদ্যোগ নিলাম। অগত্যা একটি টিনের ঘরের ব্যবস্থা হল যেখানে গণভাবে বোর্ডিংয়ের ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা হয়।

আমাদের আলেম পরীক্ষার সময় সিরাজগঞ্জ মাদরাসার একজন সাবেক ছাত্র নেতা তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনি পরীক্ষা শেষে একটি অনুষ্ঠানে আমাদেরকে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত দিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েজন ছাত্রনেতার ঠিকানা দিয়ে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করলেন। তখন সামরিক শাসনের কারণে রাজনৈতিক দলের যেমন কর্মকাণ্ড বন্ধ ছিল তেমনি ছাত্র সংগঠনের কাজও ছিল বন্ধ। তবে ইসলামী আন্দোলনের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের লোকেরা মুসলিম ছাত্র মজলিস নামে তাদের কর্মতৎপরতা চালাতে থাকে বেশ কৌশলের সাথে। তিনি আমাদেরকে মুসলিম ছাত্র মজলিসের সভাপতি এবং সেক্রেটারীর নাম ঠিকানা দিলেন যোগাযোগের জন্য।

এদিকে আমাদের শিবপুর মাদরাসার আর একজন নামকরা ছাত্র এবং উদীয়মান কবি ও সাহিত্যিক নূরুল আলম রইসী সাহেব আমাকে এক চিঠিতে মাওলানা মওদূদীর (রহ.) কিছু উর্দু বইয়ের তালিকা দিয়ে এগুলো পড়ার অনুরোধ জানালেন। পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির সুবাদেই তার সাথে সে সময় কিছুটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে। তিনি শিবপুর মাদরাসা থেকে আলেম পাশ করে সিরাজগঞ্জে ফাজেলে ভর্তি হলেও ফাজিল পরীক্ষা দেন শিবপুর থেকেই। মাঝখানে তিনি মেট্রিক পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে ভর্তি হন। এডওয়ার্ড কলেজে থাকা অবস্থায়ই শিবপুর থেকে ফাজিল পরীক্ষা দেন। তার পাঠানো বইয়ের তালিকা নিয়ে পাবনায় বইগুলো খোঁজাখুঁজি করলাম। জামায়াতের অফিস তখন বন্ধ। বইগুলো একটি উর্দু বইয়ের লাইব্রেরীতে পেলাম। বইগুলো মধ্যে ছিল দ্বীনে হক (একমাত্র ধর্ম)

www.pathagar.com

সালামতি রাস্তা (শান্তির পথ) বানাও ওয়া বিগার (ভাংগা ও গড়া) শাহাদতে হক (সত্যের সাক্ষ্য) সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকার নাম।

একা একা এই বইগুলো পড়ার চেয়ে আমার সমমনা এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একত্রিত করলাম। সামরিক শাসনের কারণে জামায়াতে ইসলামীর সংগঠনে যোগদানের সুযোগ পাইনি। আমরা কয়েক বন্ধু মিলে মফস্বলে সংঘবদ্ধ হয়ে দ্বীন চর্চা করতে পারি কিনা ভেবে দেখার জন্যে শিবপুর গ্রামের উত্তরে বিকেল বেলায় মাঠে আমরা একত্রিত হলাম। 'আনজুমানে এজহারে হক' নামে একটা প্রতিষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত নিলাম। সংকল্প ছিল এই ক্ষুদ্র সংগঠনটিকে সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়ার। আমাকে এ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি করা হল। সেক্রেটারী করা হল আমার ঘনিষ্ঠ সাথী আব্দুল হাই ফারুকীকে। আমরা খুব নীরবে নিভৃত পল্লীতে এভাবে দ্বীন চর্চার, দ্বীনের সঠিক পরিচয় জানা ও বোঝার ক্ষুদ্র একটা প্রচেষ্টা শুরু করলাম। আমাদের চিন্তার খোরাক ছিল মাওলানা মওদূদীর (রহ.) সাহিত্য। কিন্তু তার সাহিত্য কর্মের চেয়েও যে বড় অবদান, ইসলামী আন্দোলন বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গঠিত একটি বিজ্ঞানসম্মত সংগঠন জামায়াতে ইসলামী এ সম্পর্কে আমাদের কোন প্রাথমিক ধারণাও ছিল না। তবে আমাদের কথা ছিল যদি আমাদের এই চিন্তা চেতনা বাস্তবায়নের জন্যে কোন ভাল প্রতিষ্ঠান পাই তাহলে আমরা সেটার সাথেই একাত্মতা ঘোষণা করে কাজ করব।

ফাজিল পাস করার পরে আমি ঢাকায় এলাম। ঢাকা আলীয়া মাদরাসার হোস্টেলে যাদের সাথে দ্রুত সময়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠল তাদের অনেকেই মুসলিম ছাত্র মজলিসের সাথে জড়িত ছিলেন। তাদের পক্ষ থেকে নাবাগত ছাত্রদের একটা সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। উক্ত অনুষ্ঠানে আমাদের আগের ব্যাচে ফাজিল ক্লাসে প্রথম হয়েছিলেন যে মেধাবী ছাত্রটি তিনিই সভাপতিত্ব করলেন। আলীয়া মাদরাসায় অধ্যয়নরত ক'জন ভাল এবং মেধাবী ছাত্রকেই দেখা গেল মাওলানা মওদূদীর বইয়ের ভক্ত। উক্ত সম্বর্ধনা সভায় আলীয়া মাদরাসায় সবচেয়ে বয়স্ক ছাত্র মাওলানা ফরিদউদ্দিন তার বক্তৃতায় বললেন এরা আলীয়া মাদরাসার সব স্কলার এবং মেধাবী ছাত্রদেরকে সাথে নিয়ে নিয়েছে। আমাকেও উক্ত অনুষ্ঠানে দুকথা বলতে হল। লাজুক প্রকৃতির হবার

www.pathagar.com

কারণে আমি প্রায়ই বক্তৃতা এড়িয়ে চলতাম। নতুন পরিচিত বন্ধুদের অনুরোধে দুকথা বলতেই হল। আমি তাদেরকে একটু পরীক্ষা করার জন্যে উক্ত অনুষ্ঠানে কিছুটা নেতিবাচক বক্তব্য দিলাম। কেবল মাত্র মাওলানা মওদূদীর বই পড়তে বলেন কেন? আর কেউ কি ইসলামের উপর গবেষণা করেননি? বই পুস্তক লেখেননি? এ ব্যাপারে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তদের কেউই কোন কথা বললেন না। তবে আমাকে তারা বিশেষ দৃষ্টিতে নিলেন। আলীয়া মাদরাসার মুসলিম ছাত্র মজলিসের নেতৃবৃন্দ আমাকে বিশেষভাবে টার্গেট নিলেন। আমার সাথে ওঠা বসাসহ সবরকমের খাতির বাড়িয়ে দিলেন। তারা সবাই আমার এক বছরের সিনিয়র এবং সবাই স্কলার হবার কারণে তাদের বন্ধুত্বকে আমিও বেশ গুরুত্ব দিলাম। এখানে আমি আমার ফেলে আসা শিবপুরের অন্তরঙ্গ পরিবেশে নতুন করে খুঁজে পেলাম।

ইতোমধ্যে একদিন আলীয়া হোস্টেলের দ্বিতীয় তলার একটা রুমে ডাকা হয় আমাকেসহ আরো কয়েকজনকে। সেখানে পরিচয় হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত বেশ কয়েকজন মেধাবী ছাত্রের সাথে। তাদের কেউ অর্থনীতি, কেউ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কেউ সমাজতত্ত্বের ছাত্র। তারা মাদরাসা-ই-আলীয়ার ছাত্রদেরকে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত দিতে এসেছেন। জেনে অবাক হলাম, সাথে সাথে কিছুটা লজ্জিতও হলাম। যাদের কাছে ইসলামের বা ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল আমাদের, তারাই উল্টো আমাদের কাছে দাওয়াত নিয়ে এসেছেন। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে উৎসাহ বোধ করলাম এটা দেখে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক উচ্চ শিক্ষায় অধ্যয়নরত মেধাবী ছাত্ররা ইসলামী আদর্শের দিকে ঝুঁকেছেন। ইসলাম এবং ইসলামী আদর্শের আলোকে নিজেদের গড়ে তুলেছেন এবং অন্যদেরকে এ পথে টানার চেষ্টা করছেন। এটা নিঃসন্দেহে একটা শুভ লক্ষণ, আবার দ্বীন কায়েম হবে, বিজয় হবেই এথেকে এ আশাবাদই সৃষ্টি হবার কথা। তাই আমি বিনা দ্বিধায় তাদের সাড়া দিলাম। আমার রেখে আসা শিবপুরের বন্ধুদের জানিয়ে দিলাম আমরা পল্লীতে বসে ক্ষুদ্র গণ্ডিসীমার মধ্যে যে সীমিত চিন্তা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম তার চেয়ে অনেক উন্নত বৃহত্তর কিছু পাওয়ার পরে আর ঐ সীমিত গণ্ডির মধ্যে

www.pathagar.com

থেকে লাভ কি? সবাইকে এই বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলনের সাথে একাত্ম হওয়ার পরামর্শ দিলাম। কারো কারো ভীষণ আপত্তি থাকলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে আমার ঐ সময়ের সকল সাথীরা বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলনে কোন না কোন পর্যায়ে শরীক হন। আমার আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামী আন্দোলনের সূচনা হয় এভাবেই।

আরও কিছু স্মৃতি

ছোট বেলায় আমার পরিবারের যে পরিবেশে মানুষ হয়েছি তা খুব বেশী উন্নত না হলেও গ্রাম বাংলার গতানুগতিক একটা দ্বীনি পরিবেশ অবশ্যই ছিল। আমাদের নিজস্ব ঘরটা ছিল মসজিদের একেবারে কাছাকাছি। ছোট বেলায় মায়ের কাছ থেকে জায়নামাজ নিয়ে মসজিদে গিয়ে নিজের ইচ্ছেমত নামাজ পড়ার গল্প মায়ের মুখেই শুনেছি। নিজে আজান দেবার চেষ্টা করেছি। ইচ্ছেমত নামাজের জামায়াতে যেখানে খুশি দাঁড়িয়ে গিয়েছি। এর কিছু কিছু চিত্র আমার মানসপটে এখনও মাঝে মাঝে ভেসে উঠে।

ফজরের আজান শুনেই আমার ঘুম ভাংত। বড় চাচা ফজরের নামাজে সূরা আল-মুরসালাত তেলাওয়াত করতেন। এ সূরায় বার বার উচ্চারিত হয়েছে "ওয়াইলুই ইয়াওমায়েজিল মুকাজ্জিবীন"।

অর্থ-"সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য"।

চাচার কণ্ঠ এই আয়াতটি উচ্চারণের সময় কান্না বিজড়িত মনে হত। নামাজের বাইরে থেকে বিছানায় শুয়ে শুয়েও এটা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতাম। কিন্তু বুঝতাম না এ সময় কান্না পায় কেন।

আরো মনে পড়ে নেপালের এক হাফেজ সাহেবের কথা। তার নাম ছিল হাফেজ আফাজুদ্দিন। সাধারণত তিনি আমাদের এলাকায় নেপালের হাফেজ সাহেব হুজুর হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। শীত মওসুমে আমাদের এলাকায় আসতেন। আমাদের বাড়ির মসজিদেও মাঝে-মাঝে থাকতেন। তিনি উপস্থিত থাকলে বড় চাচা তাকেই নামাজের ইমামতি করতে বলতেন। তার তেলাওয়াতের ধরণ প্রকৃতি ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কোন কৃত্রিমতার ছাপ ছিল না। কিন্তু ষোল আনা আবেগ দিয়ে তিনি তিলাওয়াত করতেন।

www.pathagar.com

ফজরের নামাজে তিনি সারধারণত "সূরায়ে আর-রহমান" তেলাওয়াত করতেন। মাঝে মাঝে "ফাবিআইয়্যি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান"। এমন আবেগ দিয়ে উচ্চারণ করতেন মনে হত যেন এখনই সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এ আওয়াজ ছিল যেন স্বর্গীয় এক অনন্য আওয়াজ। তখনও নিয়মিত নামাজ শুরু করিনি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে নামাজে শরীক না হয়েও হৃদয়ে একটি প্রচণ্ড আকর্ষণ অনুভব করতাম এই তেলাওয়াতের প্রতি। নামাজের বাইরেও কুরআন খতম করতেন। আমরা শিশুরা তার তেলাওয়াত শুনতে ভিড় করতাম। হাফেজ সাহেব হৃদয়বান ব্যক্তি ছিলেন, ছোটদের খুবই আদর করতেন। আমাদের গ্রামের সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করতেন। হাফেজ সাহেবের জন্যে তার ভক্তরা যে খাবার পাঠাতেন, ফল-মূল পাঠাতেন আমাদেরকে শরীক না করে তা তিনি কখনও একা-একা খেতেন না। আমি তার স্নেহের দৃষ্টিতে একটু বেশীই ছিলাম মনে হয়, বড় চাচার স্নেহের পাত্র হবার কারণে তাছাড়া আব্বার সাথেও ছিল হাফেজ সাহেবের যথেষ্ট মুহব্বতের সম্পর্ক। আমাদের পরিবারে পূর্ব থেকে চলে আসা একটা রেওয়াজ ছিল, ছোটরা মুরুব্বীদের কদমবুছি করত। ফুরফুরার সিলসিলার সাথে জড়িত যারা কমদবুছি করতেন মাথা নিচু না করে। আমি ফুরফুরার কয়েকজন পীরের ভক্তদের কদমবুছির সময় এটা দেখেছি। পীর সাহেব শক্ত ভাষায় বলতেন, খবরদার বাবা মাথা যেন হেট না হয়।" তবে ফুরফুরার বড় হুজুর আব্দুল হাই সিদ্দিকী সাহেব কদমবুছি করতে দিতেন। এক দিনের ঘটনা আব্বার উপস্থিতিতে আমাদের বাড়ির মসজিদে আমার কয়েকজন চাচাতো ভাই, যাদের একজন তখন কলেজের ছাত্র, হাফেজ সাহেবের দোয়া নেয়ার জন্যে কদমবুছি করলেন। আব্বা আমাকেও বললেন কদমবুছি করতে। আমি আব্বা চাচাদের খুবই বাধ্য অনুগত ছিলাম বলেই সকলের জানা। আমাদের পরিবারের সকল মুরুব্বীদেরকেই আমি খুব মান্য করে চলতাম। চাচাতো ভাইদের মধ্যে যারা বয়সে বড়, তাদেরকেও খুবই সম্মান করতাম। তাদের সামনে চেয়ারে বসতাম না। বয়সে বড় এমন কারো আগে হাঁটতাম না, কিন্তু কেন যেন সেদিন আব্বার কথা মানতে পারলাম না। অন্য কোন কারণে নয়, কদমবুছি করতে আমার দারুণ লজ্জা পাচ্ছিল। তাই আব্বার কথা শুনতে পারিনি। আব্বা একটু রাগ প্রকাশ করেন। পরে কি যেন একটা জিনিসের আবদার

www.pathagar.com

করেছিলাম আব্বার কাছে, তিনি বললেন তুমি হাফেজ সাহেবকে কদমবুছি কর নাই তোমাকে কিছুই দেয়া হবে না। এরপরেও আমার পক্ষে হাফেজ সাহেব হুজুরকে কদমবুছি করা সম্ভব হয়নি। আমি যখন শিবপুরের ছাত্র তখন একবার ছুটি উপলক্ষে বাড়ি ফিরছিলাম, বোয়ালমারী গ্রামের মধ্য দিয়ে ঐ গ্রাম হয়েই আমাদের গ্রামের বাড়িতে যাতায়াতের সংক্ষিপ্ত রাস্তা ছিল। আমাদের গ্রামের ভেতরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে গ্রামের বাড়ির দিকে যাচ্ছি। রাস্তার ধারে এক বাড়ির বৈঠক খানায় হাফেজ সাহেব কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল। আমাকে দেখেই তিনি কাছে ডাকলেন। আমার সাথের ব্যাগ নিজে হাতে নিয়ে পাশে রেখে বললেন, "আমার সাথে দুপুরের খাবার খেয়ে তারপর বাড়ি যাবে। যাও, নদী থেকে গোসল করে আস।" তিনি ভাংগা-ভাংগা ও উর্দু মিশ্রিত ভাষায় কথা বলতেন, শুনতে বেশ চমৎকার লাগত। আমি অনেকদিন পরে বাড়ি যাচ্ছি; মায়ের হাতে রান্না খাবার প্রতীক্ষায় মন ছিল ব্যাকুল। কিন্তু হাফেজ সাহেব নাছোড় বান্দা তার কথা না শুনে পারা গেল না। ইছামতি নদীতে গোসল সেরে হাফেজ সাহেবের সাথে জোহরের নামাজ আদায় করে খানায় শরীক হতে হল। বাড়ি গিয়ে মাকে বললাম হাফেজ সাহেব না ছাড়ায় খেয়ে আসতে হয়েছে। এই অকৃত্রিম স্নেহ, মায়া-মমতা সত্যি বিরল। মাদরাসায় পড়া না পড়া নিয়ে চাচাতো ভাইয়ের সাথে এবং নিকট আত্মীয়-স্বজনদের আধুনিক শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রায়ই নেতিবাচক কথা বার্তা শুনতে হত। আমার এক চাচাতো ভাই একদিন এভাবে আমাকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করলেন, বললেন দেখ, তোমার বড় চাচাইতো তোমাকে মাদরাসা পড়তে বেশী উদ্বুদ্ধ করেছেন। কিন্তু তার তিন ছেলের কোন একজনকেও তো মাদরাসায় পড়তে দেননি। অবশ্য বড় চাচার বড় ছেলে সেই সময়ের হাই মাদরাসা থেকে মেট্রিক পাস করে পরে কলেজে পড়েন। আমাকে তারা বিভিন্নভাবে নিরুৎসাহিত করতে থাকেন। বলতেন মাদরাসায় পড়ে কী হবে, কী করতে পারবে? প্রতিনিয়তই তারা এভাবে আমাকে নিরুৎসাহিত করতেন।

মাদরাসায় পড়েও কেউ কেউ মোটামুটি সম্মানী ব্যক্তি হিসাবে সমাজে স্থান করে নিয়েছেন, আমি কিছু হতে পারব না কেন? সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে মাওলানা রুহুল আমীন ও মাওলানা ময়েজুদ্দীন হামিদী সাহেবের বেশ সুনাম ছিল আমাদের এলাকায়। উনাদের কথা বললে উত্তরে তারা বলতেন

www.pathagar.com

তারাতো ছিলেন ধনী লোকের সন্তান। গরিবের সন্তান হিসাবে তোমার পক্ষে কি তাদের মত হওয়া সম্ভব হবে, তাদের এ ধরনের প্ররোচনায় এক পর্যায়ে আমি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ি। অবশ্য আব্বাকে একথা বলার সাহস হয়নি। আম্মাকে একদিন বললাম আমাদের বাড়িসহ আশ পাশের গ্রাম থেকে সবাই স্কুলে যায় আমি একা মাদরাসায় যাই, এটা আমার ভাল লাগে না। আমিও এবার তাদের সাথে স্কুলে ভর্তি হতে চাই। আম্মা-আব্বাকে কথাটি কোন ফাঁকে বলে ফেলেন।

আব্বা আমাকে কোন কিছু জানতে না দিয়ে একদিন হঠাৎ মাদরাসায় গিয়ে হাজির। মৌলভী মাওলানা আব্দুল আজিজ হুজুর আমাদের ক্লাস নিচ্ছিলেন। আব্বা অনুমতি নিয়ে ক্লাসে ঢুকে হুজুরকে বললেন, ছেলে নাকি মাদরাসায় না পড়ে স্কুলে ভর্তি হতে চায়। আপনি তাকে আমার পক্ষ থেকে বুঝিয়ে বলবেন। সে পড়া লেখা করে চাকরি করে আমাদের খাওয়াবে এ নিয়তে তাকে পড়তে দেইনি। আমি চাই সে যেন দ্বীনের পথে থাকে, দ্বীনের খেদমতের জন্যেই আমি তাকে বড় আশা করে মাদ্রাসায় পড়তে দিয়েছি। পরবর্তীতে হুজুর আর কিছু বলতে হয়নি। আমি এরপর কখনও মাদরাসা ত্যাগ করার চিন্তা করিনি। মাদরাসা শিক্ষা শেষ করে আধুনিক শিক্ষার ময়দানে ঘোরা ফেরা করলেও মাদরাসায় লেখা-পড়ার সুযোগটাকে আমি আমার জীবনের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ নেয়ামত হিসাবে গ্রহণ করেছি। এরপর থেকে নিজের মধ্যে কোন দিন কোন হীনমন্যতাবোধকে স্থান দেইনি। মাদরাসায় শিক্ষিত অন্যান্য ব্যক্তিদেরকে হীনমন্যতার শিকার না হওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার সাধ্যসমত চেষ্টা করেছি। আব্বার সেদিনের কথার ভাবার্থ আমি যা বুঝেছিলাম তা হলো তিনি আমাকে আল্লাহর দ্বীনের জন্যে ওয়াকফ করেছেন। আমি আমার চলার পথে সবসময় এটা স্মরণে রেখে জীবন-যাপনের চেষ্টা করেছি। আমার আব্বা-আম্মা আমৃত্যু নিজেদের যা ছিল তাতেই তুষ্ট ছিলেন। তাদের জন্যে তেমন কিছু করার আমার সুযোগ হয়নি। মহান আল্লাহ আমার আব্বার নিয়ত পূরণ করেছেন এ দিক দিয়ে যে, তাদের খাওয়া পরার দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হয়নি। বাকীটাও যেন আল্লাহ পূরণ করেন। অর্থাৎ আমাকে আমৃত্যু তাঁর দ্বীনের পথে, দ্বীন কায়েমের কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালনের তৌফিক দান করেন।

www.pathagar.com

আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি মহান আল্লাহ আমাকে দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে এ পর্যন্ত আসার তৌফিক দিয়েছেন মূলত মরহুম আব্বার আন্তরিক ইচ্ছা পূরণের জন্যে। আমার ছাত্রজীবনের চড়াই উৎরাইয়ে অর্থ কষ্টের যথেষ্ট কাহিনী আছে। কিন্তু আব্বা এতে দমে যাননি। মাঝে মাঝে জমি বিক্রি করেছেন, জমি কট কবলা রেখে টাকা যোগাড় করে দিয়েছেন। কিন্তু আমার মনের উৎসাহে ভাটা পড়ুক এটা কখনও হতে দিতেন না। তিনি আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাঝে-মাঝে বলতেন আমার মন বলে আমার ছেলে অনেক বড় একটা কিছু করবে। মনের অজান্তে আমাকে নিয়ে আব্বা যে স্বপ্ন দেখতেন সেটাই আমার ইসলামী আন্দোলনে শরীক হয়ে কাজ করার সৌভাগ্য কিনা তা আল্লাহই ভাল জানেন। আব্বা খুলে বলতেন না কিন্তু আভাসে ইংগিতে বলতেন, মাঝে মাঝে আল্লাহ আমাকে স্বপ্নে যা দেখায় তাতে মনে হয় সে কোন একটা বড় কাজের জন্যেই দুনিয়ায় এসেছে। আল্লাহ আমাকে দেখে যাওয়ার সুযোগ দেবেন কিনা কে জানে। আমার মাদরাসা পড়ার ব্যাপারে এজন্যেই বোধ হয় তিনি অনড় ভূমিকা পালন করেন।

১৯৬১ এর জুলাই মাসের দিকে সম্ভবত ঢাকা আলীয়ায় কামিল ক্লাসে ভর্তি হই। নিজের পছন্দ মতোই ফিকাহ গ্রুপে ভর্তি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। ফিকাহ গ্রুপে ছাত্র সখ্যা কম। তবে অনেকে কামিল হাদিস শেষ করে ফিকাহ গ্রুপে ভর্তি হতেন; তাদের জ্ঞানের পরিধি একটু বেশীই হত তুলনামূলকভাবে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের হোস্টেল মসজিদে আমরা জুমআ পড়তাম। আমাদের হোস্টেলের মসজিদে জুমা হত না। মাদরাসা আলীয়ার মধ্যেও বড় আকারের মসজিদ ছিল। সেখানেও শুধু ক্লাস চলাকালে জোহরের নামাজ হত। কখনও কখনও আসরের নামাজ হত কি না আমার নিশ্চিত মনে নেই।

মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে জুমআর নামাজ শেষে ড. কুদরতুল্লাহ একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি পশ্চিমা সভ্যতার উপর বক্তব্য দিতেন, তার অভিজ্ঞতার আলোকে। তাতে বেশ চিন্তার খোরাক পাওয়া যেতো। উপরন্তু ওখানে প্রশ্নোত্তর দিতেন অধ্যাপক গোলাম আযম। আলীয়া হোস্টেলেই তার সাথে প্রথম পরিচয় হয়। তার প্রশ্নোত্তর শোনার জন্যে নিয়মিত জুমআর মেডিকেল

www.pathagar.com

কলেজ হোস্টেলের মসজিদেই আদায় করতাম। ঢাকা আলীয়া মাদরাসার ছাত্র হিসেবে আমরা কয়েকজন ঢাকা মেডিকেল কলেজের এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ইসলামী মনা ছাত্রদের সাথে উঠা বসার সুযোগ পেয়ে নিজেদের বেশ ভালো লাগত। মাদরাসায় পড়া-লেখা করেও তাদের সাথে দেশ দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয়ে ভাবের আদান প্রদানের সুযোগ আমাদের জন্যে খুবই উপকারী এবং ফলপ্রসূ হয়।

তাছাড়া আমরা যারা আলীয়া মাদরাসার হোস্টেলে ছিলাম তারা বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়ামেও অংশ গ্রহণের চেষ্টা করতাম। তখন বর্তমান ইসলামিক ফাউন্ডেশনের স্থানেই সম্ভবত ইসলামিক রিসার্চ একাডেমীতে মাসিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান হত। ঐ অনুষ্ঠানেই একদিন মুসলিম ছাত্র মজলিসের সভাপতি কায়েদে আজম কলেজের শিক্ষক হাবিবুর রহমান সাহেবের সাথে দ্বিতীয় দফায় পরিচয় হয়। প্রথম পরিচয় হয়েছিল আমাদের হোস্টেলেই। তিনি এখন থেকে আমার পেছনে জোঁকের মত লেগে গেলেন। পুরানা পল্টনের ইসলামিক রিসার্চ একাডেমীর ঐ অনুষ্ঠান শেষে তিনি আমার সাথে পায়ে হেঁটে বখশী বাজারে আলীয়া হোস্টেল পর্যন্ত পৌঁছলেন। "ইসলামের আসল কাজ এভাবে নয়, সংঘবদ্ধভাবে হতে হবে।" এই আলোচনা করতে থাকেন পুরো সময়টিতেই। এরপর থেকে তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন আমার সাথে। মাঝে মধ্যে হোস্টেলে আমার রুমেও আসতে দ্বিধা করতেন না। আলীয়া মাদরাসা ঢাকায় অধ্যায়নরত অবস্থায় ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত হবার সুযোগ না পেলে হয়ত ঢাকায় আসার মনটি কখনোই শান্ত হত না। যেমন সম্ভব হয়নি সিরাজগঞ্জে। আমি আব্বা-আম্মার একমাত্র পুত্রসন্তান হবার কারণে এবং মায়ের অতিরিক্ত স্নেহ, আদর ও মায়া মমতার কারণে আমি মাঝে মধ্যে যেভাবে দুর্বল হয়ে পড়তাম তাতে সব ছেড়ে মায়ের কাছে ছুটে যেতাম।

মায়ের আদর স্নেহের পাশে দুই বোনের এক ভাই হিসাবে তাদের আদরের প্রতিও আমি ছিলাম খুবই দুর্বল। এর মধ্যে ফাজিল পরীক্ষার আগে বড় ভগ্নিপতি অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে আমার বড় বোন বিধবা হন অল্প বয়সেই। দীর্ঘদিন রোগে ভোগার পর বড় ভগ্নিপতির মৃত্যু হয়। বড় বোনের একমাত্র ভাই হিসাবে আমাকেও প্রতিদিন দুই বেলা যেতে হত তার

www.pathagar.com

দেখা শোনা করতে এবং খোঁজ-খবর নিতে। আমার ফাজিল পরীক্ষার প্রস্তুতিতেও এর কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

ঢাকার পথে রওয়ানার দিন বড় বোন থেকে বিদায়ের মুহূর্তটি ছিল খুবই করুণ এবং আবেগ তাড়িত মুহূর্ত। আব্বা-আম্মা আমাকে বিদায় দিতে চোখের পানি ফেলেছেন বলে মনে হয়নি। কিন্তু বড় বোনের বুকফাটা কান্না আমাকে সাংঘাতিক দুর্বল করে ফেলে। ঢাকায় এসে আব্বা আম্মার কথা অবশ্যই মনে পড়েছে কিন্তু বড় বোনের বুকফাটা কান্নার দৃশ্যটা যেন সবসময়ই চোখের সামনে ভাসতে থাকে। কানে ভেসে আসতে থাকে তার সেই কান্নার আওয়াজ। আমার কয়েক বন্ধুকে মাঝে মাঝে মনের অস্থিরতার কথা বলে হালকা হবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু মনের কোণে চেপে থাকা দুঃখ ব্যথা যেন কিছুতেই ভুলতে পারতাম না। একমাত্র ইসলামী আন্দোলনের পরিবেশ এবং কর্মতৎপরতাই আমাকে সকল মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে ঢাকায় টিকে থাকার শক্তি যোগায়। তাই ইসলামী আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করার সুযোগ পাওয়াটা আমার জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট রহমত এবং নিয়ামত প্রমাণিত হয়েছে।

ইসলামী আন্দোলনের প্রতি এবং ইসলামী রাজনীতির প্রতি এভাবে ঝুঁকে পড়ার ক্ষেত্রে আর একটি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। ১৯৬১ সালে আমি কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবসহ শিবপুর থেকে সিরাজগঞ্জের উদ্দেশে রওয়ানা করি, ঈশ্বরদী রেলওয়ে জংশন হয়ে ফাজিল পরীক্ষার জন্যে। দিনটি ছিল শুক্রবার। আমাদের সামানাপত্র মসজিদ সংলগ্ন বোর্ডিংয়ে রেখে আমরা জুমআ আদায় করি ঈশ্বরদী জামে মসজিদে। জুমআ শেষে কিছুক্ষণ পরে ট্রেনে উঠার কথা। জুমআর আরবী খুৎবার আগে বাংলায় কিছু কথা বলছিলেন ঈশ্বদীর খোদাবক্স খান সাহেব। তার সাথে আমার কোন পূর্ব পরিচয় ছিল না। তিনি তার বক্তৃতায় আইয়ুব খান ঘোষিত মুসলিম ফ্যামিলি ল' অর্ডিন্যান্সের ইসলাম বিরোধী দিকগুলোর বেশ কড়া এবং যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা করতেন। তৎকালীন পাকিস্তানের উভয় অংশের বিশিষ্ট এবং নেতৃস্থানীয় আলেমদের বিবৃতি সংকলিত একটি ছোট পুস্তিকাও দেখালেন। তখনও দেশে পুরোদস্তুর মার্শাল ল' চলছে। এর মধ্যে তার সাহসী বক্তব্য এবং ওলামায়ে কেরামের সাহসী ও দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য আমার কাছে

www.pathagar.com

বেশ ভাল লাগল। ভবিষ্যতের জন্যে এখান থেকেও যথেষ্ট খোরাক পেলাম যা আমার পরবর্তী জীবনের চলার পথ সহজ ও সুগম করতে সক্ষম হয়। ঢাকা আলীয়া মাদরাসার পাশেই আলীয়া হোস্টেল বা ছাত্রবাস। হোস্টেলটা মোটামুটি মানসম্মত তিন তলা বিশিষ্ট বিল্ডিং। কিন্তু তখন পর্যন্ত সবগুলো রুমে আলীয়া মাদরাসার ছাত্ররা থাকত না। অনেকেই দূরে কোথাও লজিং থাকত। কেউ আত্মীয় স্বজনের বাসা থেকে আসতো। অনেকেই কোন মসজিদে ইমামতি করার সুবাদে থাকা খাওয়ার সুযোগও গ্রহণ করত। ফলে হোস্টেলে কিছু সিট তখন পর্যন্ত খালি থাকত। সরকার এর সুযোগ নিয়ে হোস্টেলে মাঝে মধ্যে ঢাকায় আসা বিভিন্ন গ্রুপকে থাকার সুযোগ করে দিত।

আমি যখন প্রথম মাদরাসায় এবং হোস্টেলে ভর্তি হই তখন তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত একটি ফুটবল টিমকে থাকতে দেয়া হয়, আমাদের হোস্টেলে। এরপর আর এমনটি ঘটেনি। তবে ঐ সময়ে বছরে ২ বার ইমাম ট্রেনিং হত। আইয়ুব খানের ফ্যামিলি অর্ডিন্যান্সের পক্ষে আলেমদের কাজে লাগানোর জন্যে উক্ত ট্রেনিংয়ের ভেন্যু হত আলীয়া মাদরাসার অডিটরিয়াম। আর তাদের থাকার ব্যবস্থা হত আমাদের হোস্টেলে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত আলেমদের সাথে আলোচনার সুযোগ হয়। ইমাম প্রশিক্ষণে আগত আলেমদের যারা আমাদের হোস্টেলে থাকতেন, কমন রুমে পত্রিকা পড়ার সুবাদে তাদের সাথে বিশেষ করে নেতৃস্থানীয়দের সাথে বেশ মত বিনিময়ের সুযোগ হত। তাদের কী প্রশিক্ষণ দেয়া হয় সে সম্পর্কেও বেশ চমৎকার এবং চটকদার গল্প সল্পও হত। তাদের মধ্যে নবীন প্রবীণ সব ধরনের আলেম থাকতেন।

ইতোমধ্যেই ১৯৬১ সাল পার হয়ে আলীয়া মাদরাসায় ১৯৬২ সালের জীবন শুরু হয়েছে। এখন আমি কামিল দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ফাজিল ফাইনাল পরীক্ষার বছরটি নানা ঝামেলায় কাটায়ে এবার ইচ্ছা ছিল, সকল প্রকার ঝামেলা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে ভাল করে পড়াশোনা করে মাদরাসা জীবনের শেষ পরীক্ষা একটু ভালভাবে দিব। কিন্তু ইচ্ছা করলেই যে সব সময় সব কিছু ঠিকঠাক মত করা যাবে আমার জীবনের অভিজ্ঞতা এমন নয়। ১৯৬২ তে কলেজে ভর্তির সুযোগ নেয়ার জন্যে সহজ উপায় মনে করে

www.pathagar.com

সিরাজগঞ্জ আই আই কলেজ থেকে হাই মাদরাসা পরীক্ষায় অংশ নিলাম প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে। অংক, ইংরেজির দুর্বলতার কারণে পাস করলেও আমার মাদরাসার পরীক্ষার ফলাফলের ধারাবাহিকতা রক্ষা পেল না। তবে এ নিয়েই ঢাকা সিটি নাইট কলেজে ভর্তি হলাম। পুরাপুরি নিয়মিত না হলেও মাঝে মাঝে ক্লাসে যাই। এ দিকে আবার আইয়ুব খানের মার্শাল ল' এর ৪৪ মাস শেষে রাজনৈতিক দলসমূহের তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। এই সুবাদে ইসলামী আন্দোলনের ছাত্র সংগঠন হিসাবে ইসলামী ছাত্র মজলিসের সভাপতি হাবিবুর রহমান সাহেব আমার পেছনে লেগে ছিলেন। তিনি একদিন বায়তুল মুকাররমের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি অফিসে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন আমাদের আসল সংগঠনতো ইসলামী ছাত্রসংঘ। মুসলিম ছাত্র মজলিস ছিল একটা অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্যে। এখন আমরা দেশব্যাপী এর কাজ শুরু করতে চাই। ঐ দিনের প্রথম বৈঠকেই তিনি আমাকে উক্ত সংগঠনের অফিসের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করলেন। আমি চরম আপত্তি জানালাম বললাম আমি এ সংগঠনের একজন আনকোড়া নতুন মানুষ, এ দায়িত্ব নিয়ে কিভাবে পালন করব? তাছাড়া মনের মধ্যে চাপ ছিল। মাদরাসায় শেষ পরীক্ষার আগে যেন কোন বাড়তি ঝামেলায় জড়িয়ে না যাই, তাই কৌশলে এড়িয়ে গেলাম। কিন্তু আমাকে মাদরাসা-ই-আলীয়া ঢাকার ইউনিটের দায়িত্ব নিতেই হল। অল্প কিছু দিনের মাথায় আমাকে ঢাকা সিটি সংগঠনের লাইব্রেরীর দায়িত্ব নিতে হল। যেটা ছিল আলীয়া মাদরাসা ইউনিটের অতিরিক্ত দায়িত্ব। এ সংগঠন পড়া-শোনা ভিত্তিক সংগঠন হবার কারণে লাইব্রেরীর দায়িত্বে প্রচুর সময় দিতে হত। তবে আমার ভাগ্য ভাল একাজে আমি একজন খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ ও নিষ্ঠাবান একজন সহকারী পেয়ে যাই। তিনি ছিলেন পলিটেকনিকের ছাত্র ইকবাল ভাই। একই বছর সিটি শাখার সভাপতির দায়িত্ব দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রথমে ছিলেন আবুল মুকারেম মুহাম্মদ মোসলেম সাহেব, তার কিছু দিন পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজের জনাব এ, বি এম নাজেম সাহেব, সবশেষে আসলেন ইউসুফ আলী সাহেব। আমি এদের সবার সাথেই তাদের সহকারী হিসেবে কাজ করতে থাকি। কাজের চাপ কিছুটা বাড়তে থাকলে আমি আলীয়া মাদরাসায় ইউনিটের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে সিটি সংগঠনের কাজ করতে থাকি। তখন প্রথম দিকে আমাদের অফিস

www.pathagar.com

ছিল ঢাকেশ্বরী মার্কেটে দৈনিক আজাদ পত্রিকার পূর্ব দিকে। ইসলামী আন্দোলনের ছাত্র সংগঠনের কাজে ধাপে ধাপে ব্যস্ততা বাড়ার পাশাপাশি এই বছরে একদিকে জাতীয় রাজনীতিতে আইয়ুবের স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয়। অন্যদিকে মাদরাসা ছাত্রদের ঐতিহাসিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলনের সূচনা হয়।

১৯৬২ জুলাইয়ের বা জুনের দিকে পল্টন ময়দানে জীবনে প্রথম রাজনৈতিক জনসভা দেখার সুযোগ হয়। অবশ্য এর অল্প আগে বা পরে আইয়ুব খান একটা সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। সেটাও আগ্রহ নিয়েই শুনতে গিয়েছিলেন। পল্টনের রাজনৈতিক জনসভায় আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া খুব একটা ভাল ছিল না। '৫৪ তে যে নূরুল আমীনের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী জোট হয়েছিল। তারই সভাপতিত্বে আওয়ামী ন্যাপসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের একত্রে সমাবেশ আমার কাছে যেন কেমন কেমন মনে হয়েছে। ইতোপূর্বে যে শেখ মুজিবকে নূরুল আমীনের বিরুদ্ধে কঠোর বক্তব্য দিতে শুনেছি, তিনি আজ নূরুল আমীন সাহেবকে মুরুব্বী মেনে বক্তৃতা করলেন। অবশ্য পরে বিষয়টি আমার কাছে বেশ শিক্ষণীয় মনে হয়েছে। জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে মতপার্থক্য তথা পূর্ব শত্রুতা ভুলে একতাবদ্ধ হওয়া আসলেই রাজনৈতিক ময়দানের একটি বাস্তব প্রয়োজন। আমাদের পূর্বসূরী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এর জন্যে যথেষ্ট সুন্দর দৃষ্টান্ত ও ঐতিহ্য রেখে গেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে আইয়ুবের স্বৈরশাসন বিরোধী সকল গণআন্দোলন সৃষ্টির শুভ সূচনা হয় এখান থেকেই। অবশ্য তখনও ইসলামী দলগুলো এতে একাত্ম হতে পারেনি।

আলেমদের পক্ষ থেকে এই সময়ে মুসলিম পারিবারিক আইন সংশোধন বা বাতিলের আন্দোলনের সূচনা হতে থাকে। আমরা আলীয়া মাদরাসার এবং লালবাগ জামেয়া কোরআনীয়া মাদরাসার কিছু ছাত্র ইসলামী সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে উক্ত আইনের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে টেলিগ্রাম অভিযান শুরু করি। এ সময়ে তৎকালীন নেজামে ইসলাম প্রধান মাওলানা আতাহার আলী সাহেবের সাথে আমরা আলীয়ার কয়েকজন ছাত্র চকবাজারের এমদাদিয়া লাইব্রেরীর ছাপা খানার এক কক্ষে দেখা করি। উনি

www.pathagar.com

সাধারণতঃ ঢাকায় এলে ওখানেই থাকেন। কাকতালীয়ভাবে উনার নিজস্ব মাদরাসার নাম এমদাদুল উলুম। আবার এখানে যে স্থানে তিনি থাকেন সেটা এমদাদিয়া লাইব্রেরীর ছাপাখানার বাড়ী। এর মধ্যে হয়ত কোন সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে ওটা আমাদের জানা ছিল না।

মাওলানা আতাহার আলী সাহেবের সাথে আলোচনা করে জানা গেল উনি সম্প্রতি (তৎকালীন) পশ্চিম পাকিস্তান সফর করে এসেছেন এবং পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের সাথে দেখা করে এসেছেন। মুসলিম পারিবারিক আইন সম্পর্কেও তার সাথে আলাপ করেছেন। সেই সাথে তিনি নাকি আইয়ুব খানকে জানিয়ে এসেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তার প্রতি মোটেই সন্তুষ্ট নয় বরং অসন্তোষ দিন দিন বাড়ছে। আমি উনার কথা নোট করার চেষ্টা করলে তিনি বেশ জোরে শোরে মানা করলেন। মুরুব্বীর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমি আর নোট করার চেষ্টা করিনি।

লালবাগ এবং আলীয়া মাদরাসার কতিপয় ছাত্রদের নিয়ে গঠিত ইসলামী সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক হত ঢাকা আলীয়া মাদরাসা এবং লালবাগ মাদরাসার প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে খাজা দেওয়ান ফাস্ট লেইন মসজিদের বারান্দায়। আমি নিজে এই সংগ্রাম পরিষদের কোন দায়িত্বে ছিলাম না, আলীয়া মাদরাসা থেকে আমাদের বন্ধু হাফেজ নেছার আহমদ ও লালবাগ থেকে মিয়া শফিক সাহেব বিশেষভাবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও কিছু ছাত্র ভাই ছিলেন যাদের নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

এক বৈঠকে লালবাগ জামেয়া কোরআনীয়ার ছাত্র ভাইদের কেউ কেউ এভাবে সংগ্রাম পরিষদ গঠনের প্রশ্ন তুলে বেশ অচলাবস্থা সৃষ্টি করলেন। তখন পরিস্থিতি আয়ত্বের বাইরে যাওয়ার উপক্রম প্রায়। এমন সময় আমি একটু বিনয়ের সাথে বললাম, একটা শরীয়ত পরিপন্থি কাজের প্রতিবাদ করা দরকার মনে করে আমাদের কতিপয় বন্ধু একটু উদ্যোগ নিয়েছেন, এখন সবাইকে ডাকা হচ্ছে। কাজেই দ্বীনের দৃষ্টিতে জরুরী মনে হলে কে ডাকছে, কেন ডাকছে এ প্রশ্ন না তুলে আমরা সবাই মিলে কাজটা কিভাবে সামনে এগিয়ে নিতে পারি সেই বিষয়ে আলাপ আলোচনা করলেই ভাল হয়। আল্লাহর মেহেরবানীতে কোন যুক্তি তর্কের অবতারণা না করে আমার

www.pathagar.com

এই বিনীত আবেদনটি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় এবং পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এরপর পরিবার আইন অর্ডিন্যান্স বাতিলের ক্যাম্পেইন জোরদার করার জন্যে সেই প্রেক্ষাপটে আমাদের বন্ধুরা সাধ্যমত ভূমিকা রাখেন।

১৯৬২ এর মধ্যবর্তী বা প্রথম দিকে সরকারিভাবে শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে সরকারি ঢাকা কলেজের মিলনায়তনে "স্বতন্ত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নয়, বরং সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ফ্যাকাল্টি হওয়াই যথেষ্ট" এই মর্মে একটা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। উল্লেখ যে, ইতঃপূর্বে কোন কোন মহল থেকে আরবী বিশ্ববিদ্যালয়, আবার কোন মহল থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি উঠতে থাকে, মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নের জন্যে। মাদরাসা শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এ শিক্ষাকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আনার দাবি বেশ পুরানো দাবি। মাদরাসা ছাত্র শিক্ষকদের পক্ষ থেকে বহু দিন থেকেই এ দাবি করে আসা হচ্ছিল। এই দাবির প্রেক্ষিতেই ঐ বছরের শিক্ষা সপ্তাহের সরকারি কর্মচারীর আওতায় এই বিতর্কের অবতারণা করা হয়। এই খবরটি ঢাকা আলীয়া মাদরাসার ছাত্রদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আমরা দল বেঁধে ঐ বিতর্কে যোগদানের উদ্দেশে ঢাকা কলেজ মিলনায়তনে পৌঁছে যাই।

উক্ত বিতর্ক অনুষ্ঠানে আমাদের ভূমিকা ছিল কণ্ঠভোটে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে প্রস্তাব পাস করানো। উক্ত অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব (বর্তমান ড. মুস্তাফিজ) এবং আরো একজন ছাত্র তার নামটি সঠিকভাবে মনে নেই, স্বতন্ত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জোরালো এবং যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। মাওলানা ইউসুফও বেশ জোরালো বক্তৃতা করলেন। শর্ষিণার কায়েদ সাহেব হুজুরও সম্ভবত ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রোতাদের অবস্থা দেখে আয়োজকগণ আর এ নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করেননি।

www.pathagar.com

এ দিকে মাদরাসার ছাত্রদের সাধারণ সংগঠন জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার নতুন কোন কমিটি তখনও না হওয়াতে ছাত্রদের এবং মাদরাসার সমস্যা নিয়ে কথা বলার কোন প্রতিষ্ঠান না থাকায়, ব্যক্তিগতভাবে আমরা আলীয়া মাদরাসা হোস্টেলে অবস্থানকারী কিছু বন্ধুবান্ধব আমাদের দাবি দাওয়া প্রসঙ্গে কিছু প্রচারপত্র বিলি এবং পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করি।

ইতোমধ্যে লালবাগ জামিয়া কোরআনীয়ার সদর সাহেব হুজুরের কামরায় নেতৃস্থানীয় আলেমদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হবার কথা শুনে আমরা আলীয়া মাদরাসার কয়েকজন ছাত্র আমাদের দাবি দাওয়া সম্বলিত প্রচার পত্রসহ ওখানে হাজির হই। ওখানে তদানীন্তন জমিয়তে মুদাররেসিনের সভাপতি হযরত মাওলানা ওবায়েদুল হক সাহেব (ফেনী আলীয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল) লালবাগে সদর সাহেব হুজুরের কামরায় সভা হলেও তিনি বা কওমী মাদরাসার কেউ উপস্থিত ছিলেন কিনা মনে নেই। তবে সদর সাহেবের দরবার সবার জন্যে খোলা ছিল বিধায় আলীয়া নেসারের মাদরাসার বিষয়ে সভা করার নিরাপদ স্থান হিসেবে ওটাকে বাছাই করা হয়।

জমিয়াতুল মুদাররেসীনের নামে সভা আহূত হলেও সভায় জমিয়াতের বাইরে কয়েকজন গণমান্য ব্যক্তি ছিলেন। তার মধ্যে সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমে দ্বীন হিসেবে মাওলানা নূর মুহাম্মদ আযমী, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের আমীর মাওলানা আব্দুর রহীম ও সেক্রেটারী অধ্যাপক গোলাম আযমের নাম উল্লেখযোগ্য। শরীয়তপুরের পীর মোহসেনুদ্দীন দুধু মিয়াও ছিলেন। আমরা ওখানে পৌঁছেই আমাদের প্রচার পত্র বিলি করে মাদরাসার ছাত্ররা বর্তমানে কী চাচ্ছে এ সম্পর্কে তাদের অবহিত করি। পীর মোহসেনুদ্দীন ছাড়া বাকীরা বেশ গুরুত্বসহ আমাদের প্রচার পত্র গ্রহণ করেন।

উক্ত মিটিংয়ের শুরুতে আগতদের কেউ কেউ পদ্ধতিগত বা আইনী প্রশ্ন তুলে একটু পরিবেশ অন্যদিকে নেয়ার চেষ্টায় ছিলেন বলে মনে হয়। প্রশ্ন

www.pathagar.com

তোলা হল জমিয়তের বাইরের লোকেরাও উপস্থিত কিভাবে। মিটিংয়ের কার্যবিবরণীতে কী লেখা হবে। মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেব তাৎক্ষণিক এর সমাধান দিয়ে বললেন, সভা অনুষ্ঠিত হয় জমিয়াতুল মুদাররেসীনের উদ্যোগে এবং জমিয়াতের সভাপতির সভাপতিত্বে। বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে জমিয়াতের সদস্য ছাড়াও অমুক অমুক উপস্থিত ছিলেন এবং সভায় অংশ গ্রহণ করেন। উক্ত সমাধান সকলে সর্বসম্মতিক্রমে মেনে নেয়ায় আর কোন অসুবিধা হয়নি।

উক্ত সভায় সভাপতি তার উদ্বোধনী বক্তব্যে বললেন, আমাদের ছাত্ররা একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন চায়, আমরাও চাই, কিন্তু কিভাবে হতে পারে এর কোন রূপ রেখা আমাদের হাতে তৈরি নেই। তিনি এ আভাসও দেন তৎকালীন গোলাম ফারুক সাহেব নাকি এ ব্যাপারে একটা প্রজেক্ট চেয়েছেন। সেটা কিভাবে প্রস্তুত করে পেশ করা যায় সে জন্যেই এ সভার আয়োজন এবং এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন এমন ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সভায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি খসড়া পরিকল্পনা বা প্রকল্প তৈরির জন্যে মাওলানা ওবায়দুল হককে আহ্বায়ক এবং মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেবকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে একটি কমিটি করা হল। কমিটির সদস্য সংখ্যার কথা এখন মনে নেই। তবে উক্ত কমিটিতে আমার যতদূর মনে পড়ে মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী সাহেবকেও রাখা হয়েছিল। প্রকল্প তৈরি করার জন্যে একজন ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে তখনকার ঢাকা সিটি জামায়াতের আমীর খুররমজাহ মুরাদের নাম পেশ করা হলে তাও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উক্ত কমিটির পক্ষ থেকে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া পরিকল্পনা ও এর নীলনকশা ও প্রস্তাবিত ব্যয় বরাদ্দের খসড়া তিনিই প্রণয়ন করেন। পরবর্তীতে জমিয়াতুল মুদাররেসীনের প্রতিনিধি সভায় (যা মাদরাসা আলীয়া মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়) খুররাম জাহ মুরাদ সাহেবই উক্ত

www.pathagar.com

খসড়া প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। নামকরণ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হবে, না আরবী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে হবে না এ নিয়ে বিতর্কও হয়। অবশেষে সমন্বিত প্রস্তাব হিসাবে ইসলামিক এরাবিক ইউনিস্টটিউট নামকরণ করা হয়। এবং অল্প দিনের মধ্যেই মাওলানা ওবায়দুল হক ও মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেবের নেতৃত্বে গবর্নরের উক্ত খসড়া প্রকল্প চূড়ান্ত করে পেশ করা হয়। এরপর এ দাবির পক্ষে জনমত গঠনের জন্যে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিসহ মাদরাসা ছাত্রদের কতিপয় যুক্তিসঙ্গত দাবি দাওয়া নিয়ে প্রচার অভিযান শুরু করি। তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করেও আমি দাবি দাওয়া সমর্থনের আবেদন জানাতে থাকি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

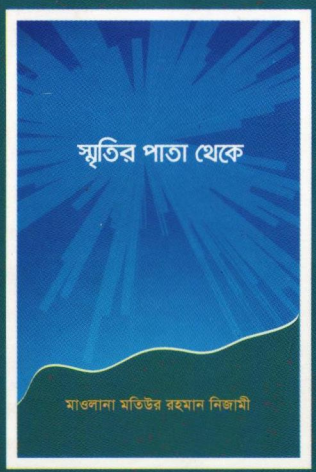
স্মৃতির পাতা থেকে
মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী